আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মুখপত্র

সুন্নীবার্তা

SUNNI BARTA

Pdf by Masum Billah Sunny
sahihaqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

AHL-E-SUNNAT WAL JAMAAT

সুন্নী বার্তা
SUNNI BARTA

প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ঃ **অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল জলিল** (এম এম -এম. এ- বিসিএস)
মহা-সচিব
আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ **অধ্যাপক এম. এ. হাই, ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ, শাহজাদা শাহ্ নূরে বেলাল, সামছুর রহমান** (জিএম), **আবদুর রাজ্জাক** এস. পি. (অবঃ)

সহযোগিতায় ঃ পীরে তরিকত ডঃ মানযুর আহমেদ রেফায়ী, পীরে তরিকত শাহ্‌জাদা ডঃ আহমদ পেয়ারা, পীরে তরীকত ডাঃ মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, মাওলানা বাকী বিল্লাহ, মাওলানা সেকান্দর হোসাইন, মুহাম্মদ জামাল মিয়া, মুহাম্মদ আবদুল মতিন, মুহাম্মদ হাশেম, মাওলানা মোবারক, নূরে আলম, আবুল হোসেন, শাকের আহমদ, মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মান্নান জেহাদী।

সম্পাদক ঃ **মাওলানা মুহাম্মদ মাসউদ হোসাইন- আল কাদেরী**
সাংগঠনিক সচিব
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

নির্বাহী সম্পাদক ঃ **মাওলানা আবুল খায়ের হাবীবুল্লাহ**
অর্থ সচিব
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

যুগ্ম সম্পাদক ঃ **মোহাম্মদ ইকবাল**
যুগ্ম প্রকাশনা সচিব
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

সার্কুলেশন ও
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার ঃ **মোহাম্মদ আবুল খায়ের**
যুগ্ম সমাজ কল্যাণ সচিব
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

প্রকাশনায় ঃ **আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত**

প্রচার ও স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন

বুলেটিন নম্বর- ২৩ ঃ হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর রওজা শরীফ, বাগদাদ, ইরাক।

সৌজন্য হাদিয়া ঃ ১০(দশ) টাকা মাত্র। US #2

প্রচ্ছদ ঃ কারবালায়ে মোয়াল্লা শরীফ

কম্পোজ ঃ মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন্স, ২২৭/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০ ফোনঃ ৯৩৪০৮০০

সূচী পত্র

	পৃষ্ঠা নং
১। সম্পাদকীয়	২
২। হাদীসে রাসুল	৩
৩। আউলিয়া কেরামের উছিলায় খোদার রহমত	৪
৪। খোদার সৃষ্টি জগতে হুজুর (দঃ)-এর রাজত্ব	১০
৫। ইমাম আজম আবু হানিফা (রহঃ)	১৪
৬। বরযখ	১৬
৭। ইসলামে তাসাউফের গুরুত্ব	২০
৮। মৃত ব্যক্তিকে ভাল বলা প্রসঙ্গে	২২
৯। সৈয়দ আহমদ বেরলভী ঃ ইতিহাসের নিরিখে	২৪
১০। মতামতঃ(১) যুগ জিজ্ঞাসা	২৮
১১। সভা সংগঠন - মহাসমাবেশ	২৯
১২। নিজস্ব পাতা	৩০-৩২

সম্পাদকীয়

সামাজিক অবক্ষয় রোধে ইসলামী আদর্শের বিকল্প নেই

সামাজিক অবক্ষয় মানেই জনগোষ্ঠীর অবক্ষয়। কেননা জনগোষ্ঠী নিয়েই সমাজ। মানুষ ব্যক্তি জীবন, পরিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনের বৃত্তের মধ্যে বিচরণ করে। সে বিচরনের মধ্যেই তার প্রয়োজন হয় শৃংখলা পূর্ণ আচরণের। নীতি ছাড়া ভাল মন্দ বুঝার উপায় নেই। যত মানুষ তত মন- আর ততগুলো মত ও পথ। এই বিভিন্ন মত ও পথকে আমরা প্রাধান্য দিই। বিভিন্ন দলের আদর্শ বাস্তবায়নে এক দল আরেকটি দলের রক্ত ঝরাচ্ছে। করছে হানাহানি। আর কলুষিত করছে সমাজ। সমাজে কেউ শিকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের, কেউ শিকার সন্ত্রাসীর, কেউবা শিকার সামাজিক নিপীড়নের।

আইন করা হলেও বন্ধ হচ্ছে না সন্ত্রাস। প্রতিটা সরকারের আমলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকলেও পদস্থ কর্মকর্তারা পর্যন্ত দুর্নীতি মুক্ত হতে পারেনি। আজ সামাজিক অবক্ষয় ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এর ফলে অবক্ষয় রোধে ধর্মীয় অনুশাসনের বিকল্প নেই। আর ধর্মীয় অনুশাসন মানুষকে শিক্ষা দেয় সঠিক পথে সঠিক ভাবে চলার।

তাই- আসুন! আমরা সকল মতবাদ, দল-মত ছেড়ে মদীনার নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতবাদ- তথা ইসলামী আদর্শ মনে প্রাণে গ্রহন করে ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল অবক্ষয় রোধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এ মহান দায়িত্ব পালনে তৌফিক দান করুন। আমিন, বিহুরমতে রাহমাতুল্লিল আলামীন।

হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আলহাজ্ব মাওলানা মাসউদ হুসাইন আলকাদেরী

وَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ مِنْ قَبَضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَرْضِ فَجَاءَ بَنُوْا اٰدَمَ عَلٰى قَدْرِ الْاَرْضِ -مِنْهُمُ الْاَحْمَرُ وَالْاَبْيَضُ وَالْاَسْوَدُ وَبَيْنَ ذٰلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদ ঃ হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি- তিনি এরশাদ করেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে একটি মাটির খামিরা থেকে তৈরী করেছেন- যেই মাটির খামিরাতে পৃথিবীর সমস্ত জায়গার মাটির অংশ ছিল। এ জন্যই আদম সন্তানগণ পৃথিবীর মধ্যে (মাটির বিভিন্নতার কারণে) আবির্ভূত হয়েছে লাল, সাদা, কালো ও মধ্যম রংএ। কেউ নরম প্রকৃতির- কেউবা শক্ত প্রকৃতির- কেউ অপবিত্র (কাফির)- কেউবা আবার পবিত্র (মুসলমান) (আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ)

বিশ্লেষণ ঃ আল্লাহ তায়ালা হযরত আজরাঈল আলাইহিস সালামকে দিয়ে পৃথিবীর সকল প্রকার মাটি এবং পানি থেকে কিছু কিছু অংশ একত্রিম করে একটি মাটির খামিরা তৈরী করান এবং সে খামিরা দিয়ে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেন। এ জন্যই পৃথিবীর মাটির রং -এর বিভিন্নতার কারণে আদম সন্তানগণও কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ মধ্য রং, আবার নরম মাটির কারণে নরম স্বভাবের, শক্ত মাটির কারণে শক্ত স্বভাবের হয়ে থাকে। আবার পবিত্র মাটির কারণে মুসলমান এবং নাপাক বা অপবিত্র মাটির কারণে কাফির মুনাফেক হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে থাকে।

মাসআলা ঃ হযরত আদম আলাইহিস সালামের দেহ তৈরীতে মাটি সংগ্রহের কাজে হযরত আজরাঈল আলাইহিস সালাম ছিলেন। সেই দিন থেকেই তাঁকে আদম সন্তানগণের রূহ কবজের দায়িত্বও দেয়া হয়েছে।

শিক্ষণীয়ঃ আদম সন্তানগণের শরীরের মূল হলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম- তাই মানুষকে মাটির মানুষ বলা হয়। কিন্তু রূহের মূল হলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন। সমস্ত রূহ তাঁর থেকে। রূহ হলো নূর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর মোবারক থেকেই সকল রূহ তৈরী করা হয়েছে। আমাদের রূহ হলো 'নূর' আর শরীর হলো মাটি। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারক ও রূহ মোবারক-উভয়ই নূর। কেননা, তিনি সমস্ত রূহের মূল। এ জন্যই তিনি হলেন নূরে মুজাচ্ছাম অর্থাৎ নূরের দেহ ধারী।

আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির সূচনা সরাসরি মাটি থেকে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টির সূচনা হয়েছে আল্লাহর নূর থেকে। তাই তিনি জাতী নূরের জ্যোতি। তিনি নূরে মুজাচ্ছাম। অর্থাৎ- নূরের দেহধারী।

আউলিয়ায়ে কেরামের উছিলায় খোদার রহমত

মূল ঃ মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রঃ)
অনুবাদঃ কাজী মৌলানা মঈনুদ্দিন আশরাফী

পূর্ব প্রকাশের পর

পবিত্র হাদীস শরীফের আলোকেঃ

১। মসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) এর মধ্যে হযরত সুরাইহ ইবনে ওবাইদ (রাঃ) হতে হযরত আলী মুরতজা (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ জন আবদাল সম্পর্কে এরশাদ করেছেন-

يُسْقٰى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْصَرُ بِهِمْ عَلَى الْاَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ بِهِمْ عَنْ اَهْلِ الشَّامِ الْعَذَابُ

অর্থাৎ ঃ এ চল্লিশজন আবদালের উসিলায় বৃষ্টি হয়, শত্রুদের উপর বিজয় অর্জিত হয় এবং সিরিয়াবাসীদের থেকে আজাব দূরীভূত হবে।

(মিশকাত শরীফ, ইয়ামেন ও শামের আলোচনা অধ্যায়)

বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের উসীলায় বৃষ্টি, বিজয়, সাহায্য অর্জন হয় এবং বিপদ দূরীভূত হয়।

(২) দারমী শরীফে বর্ণিত আছে যে, একবার মদীনা শরীফে বৃষ্টি বন্ধ হয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। লোকেরা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর নিকট (এ সম্পর্কে) আরজ করলে তিনি বললেন-

اُنْظُرُوْا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوْا مِنْهُ كُوًى اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ فَفَعَلُوْا فَمُطِرُوْا مَطَرًا حَتّٰى نَبَتَ الشَّجَرُ وَسَمِنَتِ الْاِبِلُ حَتّٰى لَغَطَقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ-

অর্থাৎঃ হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বললেন যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওযা মোবারকের ছাদ উন্মুক্ত করে দাও, যেন নুরানী রওযা ও আসমানের মধ্যে ছাদ বাধা হয়ে না থাকে। অতঃপর লোকেরা তেমনই করল। তখন মুহূর্তের মধ্যে প্রবল বৃষ্টি হলো, উদ্ভিদ জন্মালো- যার ফলে উট এমন হৃষ্টপুষ্ট হলো যেন চর্বিতে ভরে গেল।

জানা গেল যে, আল্লাহর প্রিয়জনদের কবরের উসিলায়ও বারিধারা আসে।

(৩) শরহে ছুন্নাহ এর মধ্যে আবি মুনকাদির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোলাম হযরত ছফীনা (রাঃ) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর যুগে শত্রু কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছিলেন। তিনি কয়েদ থেকে পালাচ্ছেন। হঠাৎ একটা বাঘ সামনে এসে গেল। তিনি বাঘকে বললেন-

يَا اَبَا الْحَارِثِ! اَنَا مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ اَمْرِى كَيْتَ فَاَقْبَلَ الْاَسَدُ لَهٗ بَصْبَصَةً حَتّٰى اَتٰى اِلٰى جَنْبِهٖ كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا اَهْوٰى اِلَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَمْشِىْ اِلٰى جَنْبِهٖ حَتّٰى بَلَغَ الْجَيْشَ ثُمَّ رَجَعَ الْاَسَدُ-

অর্থাৎঃ হে আবুল হারেছ (বাঘ!) আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোলাম হই। আমার ঘটনা এরকম। এটা শুনে বাঘ লেজ নাড়তে নাড়তে হযরত ছফিনা (রাঃ) এর নিকট আসলো এবং সাথে সাথে চলল। যখন কোন আওয়াজ শুনত- তখন তাড়াতাড়ি এদিকে ওদিকে গিয়ে পালাতো এবং পুনরায় হযরত ছফীনা (রাঃ) এর নিকট এসে যেত। মোট কথা- বাঘটা সাধ্যমত তার হেফাজত ও খেদমতে আত্মনিয়োগ করলো এ পর্যন্ত যে, তিনি মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে পৌছে গেলেন"।

বুঝা গেল যে, হুযুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উসীলায় বাঘও অনুগত হয়ে যায় এবং হুজুরের গোলামদের খেদমত করে।

فَوَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا وَضَعَهَا حَتّٰى ثَارَ السَّحَابُ اَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهٖ حَتّٰى رَاَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلٰى لِحْيَتِهٖ -

অর্থাৎঃ আল্লাহর শপথ, এখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়ার পবিত্র হস্ত নামেনি, এদিকে পাহাড়ের মত মেঘ উঠল। এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর শরীফ হতে এখনও অবতরণ করেননি, এ দিকে বৃষ্টির পানি তাঁর দাঁড়ি মুবারক দিয়ে টপকে পড়ছিল। সাত দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন পরবর্তী জুমায় পূনরায় অতিবৃষ্টির অভিযোগ করা হলো-

فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيْرُ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِّنَ السَّحَابِ اِلَّا انْفَجَرَتْ

অর্থাৎঃ তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার জন্য হস্ত উত্তোলন করলেন এবং আরয করলেন যে, মওলা! এখন আমাদের উপর বর্ষণ বন্ধ হোক এবং আশে পাশে কোথাও চলে যাক। তৎপর মেঘকে যেদিকে ইশারা করলেন সেদিকে কেটে গেল। (মিশকাত শরীফ, মুজেযা অধ্যায়)

বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম বিপদসমূহের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওসীলা অবলম্বন করতেন। সরাসরি আল্লাহর নিকট চাইতেন না।

(৬) মুসলিম শরীফ ও বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এররশাদ করেছেন-

اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ

অর্থঃ আমি বন্টনকারী এবং আল্লাহ দানকারী (মিশকাত শরীফ ইলমের অধ্যায়)

বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহ হুজুর পুর-নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্টন করেন এবং বন্টনকারী হলেন ওসীলা। অতএব, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্রষ্টার প্রত্যেক নেয়ামতের উসীলা হন।

(৭) মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত মায়েয ইবনে

(৪) মুসলিম ও বুখারী শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, পবিত্র মেরাজের রাত্রে পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামায ফরজ হয়েছিল। হুযুর (দঃ) ফিরতি পথে মুছা (আঃ)-এর সাথে দেখা হলো-

فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَ اُمِرْتَ؟ قُلْتُ اُمِرْتُ بِخَمْسِيْنَ صَلٰوةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيْعُ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ التَّخْفِيْفَ لِاُمَّتِكَ

-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আমি মিরাজ থেকে ফিরবার সময় যখন মুছা (আঃ) এর পার্শ্ব অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আদেশ লাভ করেছেন? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- প্রত্যহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায! মুছা (আঃ) বললেন, হুযুর! আপনার উম্মতের মধ্যে এতটুকু শক্তি নেই, আমি বণী ইসরাইলকে পরীক্ষা করেছি। আপনার উম্মতের জন্য পরওয়ারদেগারের নিকট ফিরে গিয়ে নামায কমানোর প্রার্থনা করুন। (যেন পঞ্চাশ থেকে কমিয়ে দেন)। (মিশকাত শরীফ, মেরাজের অধ্যায়) অতঃপর বার বার অনুরূপ আরজ করায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই বাকী রইল। অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন।)

জানা গেল যে, হযরত মুছা (আঃ) এর উসীলায় এ অনুগ্রহ ও কৃপা লাভ হয়েছে যে, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে শুধু পাঁচ (ওয়াক্ত) অবশিষ্ট রইল। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার খাস বান্দাদের উসীলা তাঁদের ওফাতের পরও কল্যাণকর হয়ে থাকে।

(৫) মুসলিম শরীফ ও বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তখন জুমার দিন খোৎবার মধ্যখানে একব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এ বিষয়ে আরজ করলেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ অবস্থায় দোয়ার জন্য হাত মুবারক উত্তোলন করলেন।

মালেক আসলামী হতে একটি বড় ধরনের পাপ সংঘটিত হয়ে গেল। তখন তিনি রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন-

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ طَهِّرْنِىْ-

অর্থাৎঃ হে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে গুনাহ হতে পবিত্র করুন। (মিশকাত শরীফ শাস্তির অধ্যায়)

বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কোন সময় প্রতিপালকের অবাধ্যতা করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করতেন যে, আমাদেরকে পবিত্র করুন। কেননা, তাঁরা হুজুর আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাজাতের উসীলা হিসেবে জানতেন।

(৮) মুসলিম শরীফ বাবুস সুজুদ (সেজদার অধ্যায়) এ বর্ণিত আছে যে, হযরত রবীয়া ইবনে কাব (রাঃ) হুজুর (দঃ) এর খেদমতে আরয করলেন-

اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ

অর্থাৎঃ "ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আপনার দরবারে প্রার্থনা করছি যেন বেহেস্তে আপনার সাথে থাকি"।

বুঝা গেল যে, সম্মানিত সাহাবাগণ (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রতিপালকের সকল নেয়ামত এমন কি বেহেস্ত অর্জনের উসীলা মনে করে হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে জান্নাতের প্রার্থনা করতেন।

(৯) তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত কবসা (রাঃ) এর ঘরে তার মশকে (চামড়ার তৈরী পানির থলে) মুখ মুবারক লাগিয়ে পানি পান করলেন।

فَقُمْتُ اِلٰى فِيْهَا فَقَطَعْتُهُ

অর্থাৎঃ আমি ঐ মশকের মুখ কেটে নিলাম। (মিশকাত- বাবুল আশরের) এর ব্যাখ্যায় 'মিরকাত শরহে মিশকাত' এর মধ্যে হযরত আল্লামা মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন-

اَىْ فَمِ الْقِرْبَةِ فَحَفِظْتُهُ فِىْ بَيْتِىْ وَاتَّخَذْتُهُ شِفَاءً

অর্থাৎঃ আমি মশকের মুখ কেটে নিয়ে ঘরে সংরক্ষিত রেখেছি। যাতে এর দ্বারা আরোগ্য অর্জন করা যায়।

বুঝা গেল যে, সাহাবীরা এ মশকের মুখ দ্বারা রোগাক্রান্তদেরকে আরোগ্য করতেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে স্পর্শ হবার বরকতে ঐ চামড়াকে আরোগ্য অর্জনের উসীলা মনে করতেন।

(১০) মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আসমা (রাঃ) এর নিকট, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জুববা শরীফ ছিল এবং তিনি বলতেন-

هٰذَا جُبَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ لَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضٰى يُتَشْفٰى بِهَا-

অর্থাৎঃ এ জুব্বা শরীফ হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ)-এর নিকট ছিল। হুযুরের ওফাতের পর আমি এটা নিয়ে নিয়েছি। এ জুব্বা শরীফ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিধান করতেন। আর এখন আমরা এ কাজ করি যে, মদীনা শরীফে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়ে যায় তাকে এটা ধুয়ে পান করাই। এতে আরোগ্য হয়ে যায়।
(মিশকাত শরীফ- পোষাকের অধ্যায়)

বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীর মোবারকের সাথে স্পর্শকৃত জুব্বা শরীফকে আরোগ্যের উসীলা মনে করে এটা ধুয়ে পান করতেন।

(১১) নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীদের একটি দল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হলো এবং আরজ করলো যে, আমাদের নগরীতে এবাদতখানার নাম- 'বিআ (ইহুদীদের উপাসনাগার)। আমরা ইচ্ছা করছি যে, এটা ভেঙ্গে মসজিদ নির্মাণ করব-

فَاسْتَرْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طُهُوْرِهٖ فَدَ عَابِمَاءٍ

যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়িদুনা হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ) এর সম্মানিতা মাতা হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদকে স্বীয় জামা দিয়ে কাফন দিয়েছেন এবং বেশ কিছুক্ষণ তাঁর কবরে শুয়ে অবস্থান করেছেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন-

اِنِّى اَلْبَسْتُهَا لِتُلْبَسَ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ وَاضْطَجَعْتُ مَعَهَا فِىْ قَبْرِهَا لِاُخَفِّفَ عَنْهَا ضُغْطَةَ الْقَبْرِ-

অর্থাৎ- আমি আমার চাচী সাহেবাকে স্বীয় জামা এজন্য পরিধান করিয়েছি, যাতে তাকে জান্নাতের পোষাক পরিধান করানো হয় এবং কবরে এজন্য অবস্থান করেছি, যাতে তিনি কবর সংকোচন হতে নিরাপত্তা পান।

বুঝা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক পোষাক জান্নাতী পোষাক অর্জনের উসীলা এবং যে স্থানে তাঁর পবিত্র চরণ পড়বে, ওটা মুসিবত থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

(১৪) মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছেঃ

اِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِيْنَةِ بِاٰنِيَتِهِمْ فِيْهَا الْمَاءُ فَمَا يَاْتُوْنَ بِاِنَاءٍ اِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيْهَا-

অর্থাৎঃ যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়তেন তখন মদীনা শরীফের শিশুরা পাত্রসমূহে পানি নিয়ে আসত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকের পাত্রে হাত মুবারক ডুবাতেন।

বুঝা গেল যে, মদীনাবাসীগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাত মুবারকের বরকতকে রোগাক্রান্তদের আরোগ্য লাভের উসীলা মনে করতেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদেরকে নিষেধ করতেন না। বরং স্বীয় হাত মুবারক পানিতে ডুবিয়ে দিতেন।

(১৫) মুসলিম শরীফ ও বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

فَتَوَضَّاَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ اَرْصَبَّهُ مَا فِىْ اِدَاوَةٍ وَاَمَرَنَا فَقَالَ اُخْرُجُوْا فَاِذَا اَتَيْتُمْ اَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوْا بِيْعَتَكُمْ وَالضِحوا مَكَانَ هٰذَا الْمَاءِ فَاتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا-

অর্থাৎঃ আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে তাঁর গাসালা মুবারক (ব্যবহারকৃত পানি এর জন্য ফরিয়াদ করলাম। তখন তিনি পানি আনিয়ে অযু করলেন এবং কুল্লি করলেন। আর কুল্লি ও অযুর এ পানিটুকু একখানা পাত্রে ঢেলে আমাদেরকে দান করলেন এবং নির্দেশ দিলেন- যাও, আপন বি'আতে এ পানি ছিটিয়ে দাও এবং ঐখানে মসজিদ নির্মাণ কর। মিশকাত শরীফ।

বুঝা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যবহৃত পানি হচ্ছে আভ্যন্তরীন অপবিত্রতা দূর করার উসীলা।

(১২) ইবনুল বার (রঃ) কিতাবুল ইস্তিশাব- ফি মারিফাতীল আসহাব-এ লিখেছেন যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ) ইন্তেকালের সময় ওসিয়ত করেছিলেন- "আমাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানা কাপড় দান করেছিলেন। আমি এ দিনের (অর্থাৎ মৃত্যুর দিনের জন্য রেখে দিয়েছি। এ কাপড় খানা যেন আমার কাফনের নিচে রাখা হয়।" তিনি আরও বল্লেন-

خُذْ ذَالِكَ الشَّعْرَ وَالْاَظْفَارَ فَاجْعَلْهُ فِىْ فَمِى وَعَلٰى عَيْنَىَّ وَمَوَاضِعَ السُّجُوْدِ مِنِّى

অর্থাৎঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ চুল মোবারক ও নখ মুবারক নাও এবং এগুলো আমার মুখে, চক্ষুদ্বয়ে ও সেজদার স্থানে রেখে দিও।

বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তবারুকসমূহকে কবরে শান্তির উসীলা মনে করে নিজেদের কবর সমূহে সংগে নিয়ে যান। (আল্ হারফুল হাসান)

(১৩) মুহাদ্দিস আবু নঈম (রাঃ) 'মাবাফাতুস সাহাবাতে ও মুহাদ্দিস দায়লমী (রঃ) মসনদুল ফেরদাউসে বর্ণনা করেছেন

الدَّرَجَاتِ فَلِكُلٍّ مِنَ الْاَتْقِيَاءِ وَ الْاَوْلِيَاءِ

অর্থাৎঃ পাপীদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হবে। কিন্তু, উচ্চ মরতবা প্রদান করার শাফায়াত তো প্রত্যেক পরহেজগার ও ওলীগণের জন্য রয়েছে।

বুঝা গেল যে, প্রত্যেক স্তরের ঈমানদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উসীলার মুখাপেক্ষী। পাপী মানুষও হুজুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুপারিশ দ্বারা বেহেস্তী হয়ে যাবে এবং ওলীরা হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বেপরওয়া নয়। (অর্থাৎঃ প্রত্যেকেই তাঁর মুহ্তাজ)

(১৮) ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلٰثَةُ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ-

অর্থাৎঃ কিয়ামত দিবসে তিন সম্প্রদায় শাফায়াত করবেন- (১) আম্বিয়া কেরাম, (২) হাক্কানী ওলামায়ে কেরাম, (৩) ও শহীদগণ। (মিশকাত শরীফ, বাবুশ শাফায়াত।

প্রিয় পাঠকগণ, বুঝা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে ওলামায়ে কেরাম ও শহীদগণ সকল মুসলমানের জন্য মুক্তির উসীলা।

(১৯) তিরমিযী শরীফ, দারমী শরীফ ও ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِى اَكْثَرُ مِنْ بَنِى تَمِيْمٍ-

অর্থাৎঃ আমার একজন উম্মতের সুপারিশে বনী তামীম গোত্রের চেয়েও বেশী মানুষ বেহেস্তে যাবে। (মিশকাত শরীফ-শাফায়াতের অধ্যায়)।

এর ব্যাখ্যায় 'মিরকাত শরহে মিশকাত' এ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন-

قِيْلَ اَلرَّجُلُ عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ وَقِيْلَ اُوَيْسُ

করেছেন-

يَاْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْا وافنام مِنَ النَّاسِ فَيَقُوْلُوْنَ هَلْ فِيْكُمْ مِنْ صَاحِبِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ-

অর্থাৎঃ মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যে, তারা জেহাদ করবে। তাঁরা জিজ্ঞাসিত হবে- তোমাদের মধ্যে রসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন সাহাবী আছে? উত্তর দেয়া হবে- হ্যাঁ। ঐ সাহাবীর উসিলায় বিজয় লাভ হবে"।

বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের উসীলায় জেহাদে বিজয় অর্জিত হয় এবং তাঁদের উসীলা গ্রহণের নির্দেশও রয়েছে। অন্য হাদীসে তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের উসীলার কথাও উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর ওলীদের উসীলায়ও সাহায্য অর্জিত হয়।

(১৬) বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَ تُرْزَقُوْنَ اِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ-

অর্থাৎঃ তোমাদের বিজয় লাভ হতো না এবং জীবিকা অর্জিত হতো না- কিন্তু অসহায় ঈমানদারদের বরকতে ও উসীলায়। মিশকাত শরীফ বাবু ফাজলীল ফোকারা।

বুঝা গেল যে, গরীব অসহায়দের উসীলায় বৃষ্টি হয়, জীবিকা অর্জিত হয়, বিজয় সাহায্য লাভ হয়।

(১৭) তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ ও ইবনে মাজা শরীফ ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

شَفَاعَتِى لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِى،

অর্থাৎঃ আমার সুপারিশ ও শাফায়াত হবে আমার উম্মতের গুনাহে কবীরা কারীদের জন্য (মিশকাত-বাবুশ শাফায়াত)।

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) "লোমায়াত শরহে মিশকাত" এর মধ্যে বলেন-

اَىْ لِوَضْعِ السَّيِّئَاتِ وَاَمَّا الشَّفَاعَةُ لِرَفْعِ

اَلْقَرْنِى وَقِيْلَ غَيْرُهُ

অর্থাৎঃ কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেন- ঐ ব্যক্তি হলেন হযরত ওসমান গণি (রঃ) আর কেউ বলেন- ঐ ব্যক্তি হলেন হযরত ওয়াইস করণী (রাঃ) আর কেউ বলেন- অন্য কোন বুজুর্গ।

বুঝা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতও নাজাতের উসীলা।

(২০) শরহে সুন্নাহ নামক হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একবার হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও তশরীফ নিচ্ছিলেন। তখন একটি উট- যা ক্ষেতে কর্মরত ছিল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখল। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাঁটু মুবারকের উপর মুখ রেখে ফরিয়াদ জানাল। ছরকারে দো-আলম (দঃ) তার মালিককে ডেকে বললেন-

اَنَّهُ شَكٰى كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَاَحْسِنُوْا اِلَيْهِ-

অর্থাৎঃ এ উটটি অভিযোগ করছে যে, তুমি এর দ্বারা অতিরিক্ত কাজ নিয়ে থাক অথচ খাদ্য কম দিয়ে থাক। এর সাথে সৎব্যবহার করবে।

(মিশকাত শরীফঃ মো'জেজা অধ্যায়)

বুঝা গেল যে, বুদ্ধিহীন জীবও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রয়োজন মিটানোর উসীলা মনে করে। তাই যে মানুষ উসীলাকে অস্বীকার করে, সে উটের চেয়েও অধিকতর বিবেকহীন।

(২১) হুজুর পাক (দঃ) এর উসীলায় আবু লাহাবের শাস্তি কিছু হ্রাস হয়েছে। কেননা তার দাসী ছোয়াইবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের সুসংবাদ আবু লাহাবকে দিলে সে খুশী হয়ে উক্ত দাসীকে আযাদ করে দিয়েছিলো। (বোখারী শরীফঃ কিতাবুর রিদা)

বুঝা গেল যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উসীলা এমন নেয়ামত, যার উপকার আবু লাহাবের ন্যায় কট্টর কাফির মরদুদও কিছু পেয়েছে। মুসলমানতো হচ্ছে তাঁর একান্ত অনুগত।

(২২) বোখারী শরীফে মসজিদ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হজ্বে যাবার পথে ঐ সকল স্থানে নামাজ পড়তেন, যে সব স্থানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্বের সময় নামাজ পড়েছিলেন। বোখারী শরীফে এসব স্থানেরও উল্লেখ রয়েছে। **বুঝা গেল, যে স্থানে বুজুর্গব্যক্তি ইবাদত করেন ঐ স্থানটি কবুলিয়াতের (গ্রহণযোগ্যতার) উসীলা হয়ে যায়।**

সুন্নী বার্তার জন্য লেখা আহ্বান

আসন্ন ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে সুন্নী বার্তা বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যায় বিশেষ লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

১। ওহাবী মওদুদী তাবলীগী কাদিয়ানী ইত্যাদি বাতিল ফের্কার খন্ডনে দলীল ভিত্তিক প্রবন্ধ, লেখা, সংবাদ মতামত-ইত্যাদি প্রেরণ করলে আমরা যত্নের সাথে তা সুন্নী বার্তায় প্রকাশ করবো।

২। সুন্নী বার্তায় সুন্নী সম্মেলনের প্রতিবেদন, সংবাদ প্রেরণ করুণ। সাথে ৫০০/- টাকা মনিঅর্ডার যোগে পাঠানোর রশিদ সংযোজন করে দিন।

৩। স্থানীয় সুন্নী সংগঠনের তৎপরতা ও কার্যক্রম এবং সভা ও সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি সুন্নী বার্তায় প্রেরণ করুন এবং সাথে ১০০/- টাকার মনিঅর্ডার রশিদ প্রেরণ করুন। মাহফিলের ১ মাস পূর্বে তা পাঠাতে হবে।

৪। স্থানীয়ভাবে এজেন্সী সংখ্যা বৃদ্ধি করুন এবং সুন্নী বার্তা পাঠক ফোরাম গঠন করুন।

৫। বিতর্কিত যে কোন মাসআলার সুন্নী সমাধান ভিত্তিক প্রবন্ধ সাদরে প্রকাশ করা হবে। গবেষণা মূলক প্রবন্ধের জন্য সম্মানীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬। যে কোন সুন্নী হাক্কানী দরবারের ইতিহাস, কার্যক্রম ১০০০/-টাকার বিনিময়ে এক পৃষ্ঠায় ছাপানো হবে।

৭। মহিলাদের সমস্যাবলী ও তার ধর্মীয় সমধান শীর্ষক প্রবন্ধ সুন্নী বাতায় প্রকাশ করা হবে। মহিলাদের লেখা শর্ত সাপেক্ষে ছাপা হবে।

(৮) প্রশ্ন উত্তর আকারে ইসলামী আক্বিদা ও মাসায়েল পাঠালে তা সাদরে ছাপানো হবে।

৯। প্রশ্নোত্তর বিভাগ নিয়মিত করার চিন্তাভাবনা সক্রিয় ভাবে বিবেচনাধীন রয়েছে। আর্থিক সঙ্গতি সাপেক্ষে সুন্নী বার্তার কলেবরও বৃদ্ধি করা হবে।

১০। প্রতি লাইন ফাঁক ফাঁক করে লেখতে হবে এবং প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ১০ তারিখের পূর্বে লেখা পাঠাতে হবে।

যাবতীয় যোগাযোগ ও টাকা পাঠানোর ঠিকানা

অধ্যক্ষ হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল জলিল

১/১২, তাজমহল রোড (২য় তলা), ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন ঃ ৯১১১৬০৭

হুজুর কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাজত্ব

সালতানাতে মোস্তফা

মুফ্তি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ)

কুরআনের আয়াত দ্বারা হুযুর (দঃ) এর রাজত্ব প্রমাণ ঃ

وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ-

(১) (তাদের কাছে কি খারাপ লেগেছে? এটা নয়কি যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ অনুগ্রহে ওদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছেন। পারা-১০, রুকু-১৫)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও লোকদেরকে ধনী ও সম্পদশালী করার ক্ষমতা রাখেন। অন্যদেরকে সম্পদশালী তিনিই করতে পারেন, যিনি স্বয়ং সম্পদের মালিক। উল্লেখ্য যে, فَضْلِهٖ (তাঁরই অনুগ্রহে) শব্দটি হুযূরের বেলায়ই প্রযোজ্য। কেননা فَضْلِهٖ শব্দের সর্বনামটি দ্বারা হুযুর আলাইহিস সালামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ وَاِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ-

(২) (কতইনা ভাল হতো যদি- তারা ঐ বস্তুর উপর সন্তুষ্ট হতো, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তাদেরকে দিয়েছেন এবং বলতো- আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট- স্বীয় অনুগ্রহে আল্লাহ আমাদেরকে আরও দান করবেন এবং তাঁর রসুলও। আমরা আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত। (পারা-১০, রুকু-৭)

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করেছেন এবং করবেন। তিনিই দান করতে পারেন- যিনি দান করার ক্ষমতা রাখেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই দান করেন, যা আল্লাহ দান করেন। কেননা উক্ত আয়াতে যে কোন কিছু প্রদান করার সম্পর্ক উভয়ের দিকে করা হয়েছে। তাই আল্লাহ যেহেতু সব কিছু দান করেন, সেহেতু হুযুরও সব কিছু দান করেন। ধনের বেলায় যেভাবে সব কিছুর বেলায়ও সেভাবে।

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ

(৩) "হে মাহবুব! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি আপনাকে কাউসার দিয়ে দিয়েছি।"

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাউসার দান করেছেন। কাউসার দ্বারা বিভিন্ন অর্থ বুঝানো হয়েছে, যেমন 'হাউজে কাউসার' প্রচুর কল্যাণ, অনেক উম্মত, মকামে মাহমুদ, শাফাআতে কুবরা, অসংখ্য মুজেযা, দুনিয়াবী প্রভাব, রাজ্য বিজয়, সমগ্র সৃষ্টিকুলে প্রাধান্য, সমগ্র সৃষ্টি জগত- ইত্যাদি। যে অর্থই গ্রহণ করা হোক, আল্লাহ যে দিয়েছেন এবং অনেক কিছু যে দিয়েছেন, তা এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। মাহবুব আলাইহিস সালাম তা গ্রহণ করেছেন। দাতার কোন দান গ্রহণ করার দ্বারা গ্রহীতা মালিক হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারেনা। তাছাড়া اَعْطَيْنَا অতীতকালবোধক ক্রিয়া। এর দ্বারা বুঝা যায় যে প্রদান করার কাজটা অতীতে হয়ে গেছে এবং হস্তান্তরও হয়ে গেছে। ইসমাঈল দেহলভীর 'তাকবিয়াতুল ঈমান গ্রন্থে' উল্লেখিত আছে- 'যার নাম মুহাম্মদ বা আলী, সে কোন কিছুর মালিক বা ক্ষমতার অধিকারী নয়"। নাউযু বিল্লাহ। তার উক্ত দাবী আল্লাহর বাণীর সরাসরি বরখেলাপ।

সূক্ষ্ম কথাঃ দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামতকে আল্লাহ তাআলা 'কলীল' অর্থাৎ খুবই সামান্য বলেছেন- কিন্তু হুযূর আলাইহিস সালামকে যা প্রদান করা হয়েছে, সেটাকে কছির (বেশী) নয় বরং 'কাউসার' (অনেক অনেক বেশী) বলেছেন। দুনিয়াতো আমাদের আকা মওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মালিকানার কোটি ভাগের এক ভাগও নয়।

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا-

(৪) (হে মাহবুব, আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।)।

এ আয়াত থেকে এটা জানা গেল যে, আল্লাহ তায়ালা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান বিজয় দান করেছেন। যদি এ বিজয় দ্বারা রাজ্য জয় বুঝানো হয়- তাহলে এতে হুযূর আলাইহিস সালামের রাজত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা বিজয়কারী সব সময় বিজিত রাজ্যের মালিক হয়ে যায়। আর যদি আয়াতে উল্লেখিত 'ফতেহ' শব্দের অর্থ করা হয় 'খুলে দেয়া' তাহলে আয়াতের অর্থ হবে, হে মাহবুব! আমি আপনার জন্য বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছি। অর্থাৎ জান্নাত, শাফায়াত ও অন্যান্য নেয়ামতের দরজাসমূহ, যা অন্যদের জন্য বন্ধ ছিল, হুযুর আলাইহিস সালামের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে।

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنٰى

(৫) (হে মাহবুব! আপনার প্রভূ আপনাকে অভাবগ্রস্থ পেয়েছেন। অতঃপর ধনী করে দিয়েছেন)।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

(৬) (হে মাহবুব! আপনার প্রভূ আপনাকে অচিরে এতবেশী প্রদান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন)।

উপরোক্ত দু'টি আয়াতদ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীবকে এতটুকু দান করেছেন যে, তিনি উভয় জাহান থেকে বেনিয়াজ হয়ে গেছেন এবং তাঁকে আরও অনেক কিছু দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। যখন আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিলেন এবং তাঁর মাহবুব নিয়ে নিলেন, তখন এমনিতেই মালিকানা প্রমাণিত হয়ে যায়। আয়াতদ্বয়ে এটা বলা হয়নি যে- কতটুকু দিয়ে ধনী করে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে কি দিবেন। এতে বুঝা যায়- সব কিছু দিয়েছেন এবং আরও দিবেন। সৃষ্টি জগতের সম্প্রসারণের সাথে সাথে দানের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

(৭) (হে মাহবুব! আপনার প্রতি আল্লাহর বড় অনুগ্রহ রয়েছে)।

এটা দুনিয়ার রীতি যে, সৌভাগ্যশালী ও সম্পদশালী ব্যক্তি সম্পর্কে লোকেরা বলে যে, অমুকের উপর আল্লাহর বড় মেহেরবাণী। অনুরূপ আল্লাহও বলেছেন, হে মাহবুব আপনার উপর আল্লাহর বড় মেহেরবাণী। লক্ষ্যনীয় যে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র দুনিয়াকে নগণ্য বলেছেন এবং দুনিয়া শব্দের অর্থই হলো অতি তুচ্ছ ও নগন্য বিষয়। অথচ নবীজীর শানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, তিনি বড় অনুগ্রহ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, দুনিয়াটা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মালিকানার এক কোটি ভাগের এক ভাগও নয়। আল্লাহ তায়ালা হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামকে সমগ্র দুনিয়ার বাদশাহী দিয়েছিলেন। কিন্তু ওনার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেননি যে, ওনার প্রতি বড় মেহেরবাণী করেছেন। তাই বুঝা গেল যে, হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্বের পরিধি আমাদের নবীর মালিকানা ও রাজত্বের একটি প্রদেশ বা একটি জিলা সদৃশ।

এটাও লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, হুযুর আলাইহিস সালাম শরীয়তের বিধি বিধানের মালিক। কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারে ঐ পর্যন্ত গৃহীত হয় না, যতক্ষণ না হুযূর আলাইহিসসালাম পছন্দ করেন। হুযুর আলাইহিস সালাম হালাল হারামের মালিক ও পূর্ণ ইখতিয়ারের অধিকারী।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ-

(৮) হে মাহবুব, তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করে তাদেরকে পাক পবিত্র করুণ এবং তাদের জন্য দুআ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের আত্মার শান্তিদায়ক।)

এ পবিত্র আয়াতে হযূর আলাইহিস সালামকে কয়েকটি নিদেশ দেয়া হয়েছে।

এক, তওবাকারী তিনজন সাহাবায়ে কেরাম নিজ নিজ সম্পদের যে সদকা আপনার দরবারে পেশ করেছেন, তা গ্রহণ করে ওদেরকে পূতঃ পবিত্র করে দিন।

দুই, তাদের জন্য দুআ করুণ।

এতে প্রমাণিত হলো যে, সদকা যেটা একটি ইবাদত, উহা তখনই আদায় হবে, যখন হুযুর আলাইহিস সালাম গ্রহণ করবেন। যদি এ শর্তারোপ করা না হতো, সাহাবায়ে কেরাম যে কাউকে দিয়ে দিতে পারতেন। তাছাড়া শুধু

ইবাদত দ্বারা কেউ পূত পবিত্র হবে না বরং হুযুরের মেহেরবাণী দ্বারাই পবিত্রতা অর্জিত হয়। কেননা এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ সদকার বিনিময়ে আপনি ওদেরকে পবিত্র করুন।

তিন, আল্লাহ তায়ালা হুযূর আলাইহিস সালামের শাফায়াত ব্যতিরেকে কাউকেই কিছু দান করবেন না। যেমন আল্লাহ বলেছেন, ওদের জন্য দুআ করুন। আল্লাহতো ইচ্ছে করলে হুযুরের বিনা দুআয় ওদেরকে সবকিছু দিতে পারেন। কিন্তু দেননা। যখন মহাবুব বলেন, তখই দেন।

চার, সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের আমলের ব্যাপারে আশ্বস্থ হতে পারেন না- যতক্ষণ না হুযূর আলাইহিস সালাম স্বীকৃতি দেন। এ জন্যই উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে আপনার দুআর দ্বারা ওদের মনে স্বস্তিবোধ হবে।

بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے
حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے

অর্থাৎ নবীর উছিলা ছাড়া কোন কিছু আদায় করা যাবে না। আল্লাহ তাঁর হাবীরের সুপারিশ ব্যতিরেকে কিছু দান করেন না। ঐরূপ কাজ করা জ্ঞানান্ধদের কাজ।

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

(৯) তিনি (হুযুর আলাইহিস সাল্লাম) মানুষের জন্য ঘৃণিত জিনিসসমূহ হারাম করেন।

وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

(১০) কাফিরেরা ওসব জিনিসকে হারাম মনে করে না, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল হারাম করেছেন।

উপরের আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও হারাম করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। তিনি শরীয়তের বিধি-বিধানের মালিক। দেখুন, কুকুর, গাধা, বিড়াল, ইত্যাদি হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই, হুযুরের বাণী থেকেই আমরা তা জানতে পেরেছি।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ

(১১) "যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোন সিদ্ধান্ত দেন, সে ব্যাপারে নিজস্ব কিছু বলার কোন মুসলমান পুরুষ ও মহিলার কোন অধিকার নেই।"

এ আয়াতের শানে নুযুল হচ্ছে- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আযাদকৃত বিশিষ্ট খাদেম হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) এর সাথে হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশের বিবাহের প্রস্তাব দেন। হযরত যয়নাব কোরাইশ বংশের সম্মানিতা মহিলা ছিলেন। তাই ওনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ এ প্রস্তাবে অনীহা প্রকাশ করলেন। কেননা, তাঁর বোন ছিলেন কোরাইশী খুবই সম্মানিতা এবং হযরত যায়েদ (রাঃ) কুরাইশী ছিলেন না। বিবাহ শাদীতে সমগোত্রের প্রতি খেয়াল রাখা হয়। ভাই বোনের ঐ অনিহা উপলক্ষ্যে আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাইকে রাজি হতে হলো এবং বিবাহ হয়ে গেল।

এতে বুঝা গেল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের জান মাল ও সন্তান সন্ততির মালিক ও অভিভাবক এবং এমন মালিক যে, তাঁর নির্দেশের মুকাবিলায় কারো নিজ জান, মাল ও সন্তান সন্ততির ব্যাপারে কিছু বলার অধিকারও নেই। দেখুন, বিবাহে প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার অনুমতি ও নিকট আত্মীয়ের সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ বিবাহে কারো অসম্মতিকে কোন গুরুত্বই দেয়া হয়নি। **এর কারণ হলো, সমস্ত মুসলিম পুরুষ** হুযুরের গোলাম এবংসমস্ত মুসলিম মহিলা হুযুরের বাঁদী। বাঁদীকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে বিবাহ দেয়ার অধিকার মনিবের রয়েছে।

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

(১২) আপনি এই কথা বলে ঘোষণা দিন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের জানের উপর জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না"।

এ আয়াতে হুযুর আলাইহিস সালামকে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানকে বান্দা অর্থাৎ গোলাম বলার অনুমতি দেয়া

হয়েছে।

সবাইকে স্বীয় গোলাম তিনিই বলতে পারেন- যিনি সবের মালিক। মছনবী শরীফে উক্ত আয়াতের মর্ম এভাবে বর্ণিত আছেঃ

بنده خود خواند احمد در رشاد

جمله عالم را بخوان قل یا عباد

অর্থাৎ হেদায়েত কালে হুযুর আলাইহিস সালাম আমাদেরকে তাঁর বান্দা বলেছেন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বিশ্ব মুসলিমকে তাঁর বান্দা বলে সম্বোধন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

(১৩) "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও রাসুলের ডাকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দাও, যখনই রাছুল (দঃ) তোমাদেরকে ডাকেন"।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালামের আনুগত্য এবং তাঁর আহবানে যে কোন অবস্থায় হাজির হয়ে যাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। এর কারণ হলো- হুযূর আলাইহিস সালাম সবের মালিক।

আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাজত্ব ও শানমান বর্ণনাতীত। তাঁর আগমনের সাথে সাথে নব বিপ্লবের সূচনা হয়েছে, দুনিয়া বদলে গেছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর হুকুমতের পূর্বেকার নিয়মকানুন পরিবর্তন করে ফেলেছেন। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমনের আগে পৃথিবীতে হক তাআলার 'মহাপরাক্রমশালী' গুণ বিরাজমান ছিল। হুযুরের আগমনের পর তাঁর 'মহা করুণাময় ও ক্ষমাশীল' গুণ বিকশিত হয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, আগের উম্মতদের এক একটি গুনাহের জন্য আজাব অবতীর্ণ হয়েছে। কোন উম্মতের আকৃতি বিকৃত করে দেয়া হয়েছে, কোন উম্মতের উপর পাথর বর্ষিত হয়েছে, কোন উম্মতকে মহা প্লাবণ দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আবার কোন উম্মতকে আবাসভূমি সহ উলটে দেয়া হয়েছে। কোন উম্মতকে বানর ও শুকরে পরিণত করে ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের নবীর যুগে মক্কার কাফিরদের আজাব কামনার পরও কোন আজাব আসেনি। যখন মক্কার কাফিররা বললো- হে আল্লাহ! ইসলাম যদি সত্য হয়- তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ কর। এরপরও পাথর বর্ষিত হয়নি। কোন আজাবও নাযিল হয়নি এবং আল্লাহর গজবের সাগরও উৎলিয়ে উঠেনি বরং তার পরিবর্তে এ আয়াত নাযিল হয়েছেঃ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

(১৪) "এটা আল্লাহর শান নয় যে, ওদেরকে আজাব দেবে- যতক্ষণ আপনি ওদের মধ্যে আছেন"।

সুবহানাল্লাহ! ওরাতো আজাবের উপযোগী ছিল। কিন্তু রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাতিরে আল্লাহ তাআলা আজাব নাযিল করেননি। আজ যদি আমরা নিজেদের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাব- যেসব দোষ আগের উম্মতদের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে ছিল, এখন ঐসব দোষ একত্রিতভাবে আমাদের মধ্যে বিরাজমান। মাপে কম দেয়া, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, লুঠতরাজ, মিথ্যা কথা বলা- সব দোষ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু আমাদের আকৃতি বিকৃত হচ্ছেনা, পাথরও বর্ষিত হচ্ছে না এবং কোন সার্বজনীন আজাবও আসছে না। এটা একমাত্র শাহিনশাহে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর অবদান।

অনুবাদঃ মরহুম হাফেজ মঈনুল ইসলাম।

সুন্নী বার্তার গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

১। গ্রাহক (রেজিষ্ট্রি সডাক) বার্ষিক ১৭০/- টাকা।
২। গ্রাহক (সাধারণ ডাক) বার্ষিক ১৩০/- টাকা।
৩। মানি অর্ডার যোগে সডাক অগ্রিম টাকা পাঠাতে হবে।
৪। এজেন্সী ন্যূনতম ২০ (বিশ) কপি ৩০ % কমিশন।
৫। এজেন্সীর জন্য দরখাস্ত এবং ১ম কিস্তির টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।
৬। প্রতি সংখ্যা বিক্রি হওয়ার সাথে সাথে টাকা পাঠিয়ে দিন।
৭। নাম, গ্রাম, পোঃ, জেলাঃ স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

যোগাযোগ ঃ

অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলিল

১/১২,তাজমহল রোড, সি-ব্লক (২য় তলা), মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

শীঘ্রই বের হচ্ছে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই

"বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত"

আল্লামা শাহ হোসেইন গার্দেজী

আপনার কপির জন্য অগ্রীম বুকিং দিয়ে রাখুন!

যোগাযোগ ঃ

অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলিল

১/১২,তাজমহল রোড, সি-ব্লক (২য় তলা)
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ৯১১১৬০৭

হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ)

নাম ও বংশ পরিচয়

কুফা নগরী

এককালে বহু জ্ঞানী, গুণী, আলেম, পণ্ডিত, পীর-বোযুর্গের পীঠস্থান ছিল কুফা। ইসলামের ইতিহাসে ইহা ছিল জ্ঞান চর্চার একটি মহাকেন্দ্র। শুধু ধর্ম চর্চাই নয়; বরং দর্শন, ইতিহাস, শিল্পকলা ইত্যাদিরও ইহা কেন্দ্র ছিল। বহু মনীষী ও সাধক এখানে জন্মলাভ করেছিলেন। তাঁদের সাধনা ও গবেষণার ফল আজও পৃথিবীর মানুষের কাছে গৌরবের বস্তু হইয়া রহিয়াছে।

এই কূফারই একটি যুবক তখন বাজারে যাইতেছিলেন। সুন্দর কান্তি, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। লেখা পড়া তিনি করেন না, পিতৃ পিতামহের রীতি অনুযায়ী ব্যবসা করেন। ব্যবসা নিয়াই তিনি অনুক্ষণ ব্যস্ত।

হঠাৎ এক বোযর্গের দৃষ্টি পিপতিত হইল তাঁহার প্রতি।

-তুমি কোথায় যাইতেছ যুবক?

-বাজারে।

-সেখানে কি কর তুমি?

- ব্যবসা করি। আমাদের কাপড়ের ব্যবসা আছে।

-কিন্তু ওপথ তো তোমার নয়, যুবক! তোমার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা তো এই কথাই বলিতেছে যে, তুমি কোন বোযর্গের সান্নিধ্য অবলম্বন করিবে এবং জ্ঞান চর্চা করিয়া পৃথিবীর মানুষকে সুপথ দেখাইবে। যাও! আর পথে নয়, কাজে লাগিয়া যাও। আল্লাহ পাক তোমা-দ্বারা জগতের বিরাট কল্যাণ সাধন করাইবেন।

এই যুবকের নামই নো'মান। তবে তিনি আবু হানিফা নামেই খ্যাত। ইসলামের ইতিহাসে তিনি ইমাম আ'যম উপাধিতে ভূষিত।

ইমাম সাহেবের বংশ তালিকা দেখিলে মনে হয়- তিনি অনারব ছিলেন। তাঁহার আদি পুরুষগণ অন্যদেশ হইতে এখানে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল-

নো'মান বিন ছাবিত বিন যাওতী বিন মাহ্। যাওতী ও মাহ- নাম দুইটি যে আরবী নাম নয়- তাহা অতি সুস্পষ্ট; তবে মতভেদ এখানে যে, তিনি কোন্ বংশের ছিলেন এবং কেমন করিয়া আরবে আসিলেন? এই প্রসঙ্গে- বাগদাদের বিখ্যাত ঐতিহাসিক খাতীব ইমাম আবু হানিফা সাহেবের পৌত্র ইসমাইলের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইসমাইল বলেন, "আমি ইসমাইল বিন হাম্মাদ বিন নো'মান বিন ছাবেত বিন নো'মান বিন মারযেবান। আমরা পারসিক বংশোদ্ভূত। আমাদের খান্দানের কোন লোক অন্যের গোলামী করে নাই। আমার দাদা নো'মান (আবুহানিফা) ৮০ হিজরী সনে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পিতা ছাবেত শৈশবে হযরত আলী (কাঃ) এর খেদমতে হাজির হইলে তিনি তাঁহার ও তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণের জন্য কল্যাণ কামনা করিয়া দোয়া করেন। আমার বিশ্বাস, তাঁহার সেই দোয়া বিফলে যায় নাই"।

ইমাম সাহেবের নাতী ইসমাইলের উক্ত বর্ণনায় ইমাম সাহেবের দাদার নাম নো'মান এবং পরদাদার নাম মারযেবান বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। অথচ সাধারণভাবে তাঁহারা যাওতী ও মাহ্ নামে পরিচিত। যাওতী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, খুব সম্ভব তখনই তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া নো'মান রাখা হইয়াছিল। ইসমাইলের বর্ণনায় সেই ইসলাম-উত্তর কালের নামই ব্যক্ত হইয়াছে। যাওতী-র পিতার আসল নামও হয়ত অন্য কিছু হইবে। মাহ্ ও মারযেবান তাহাদের আসল নাম নয়, উপাধি মাত্র। কারণ ইসমাইলের বর্ণনায় এ কথাও ব্যক্ত হইয়াছে যে, তাহারা পারস্য দেশীয় কোন এক বিখ্যাত সম্মানিত খানদানের লোক। পারস্যে তখন শহর নেতাকে মারযেবান বলা হইত। এইজন্য ইহা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, মারযেবান কোন নাম নয়, উপাধি মাত্র। 'মাহ' শব্দটিও 'মারযেবান' এর অনুরূপ অর্থ বোধক শব্দ। অতএব উহাও কাহারও নাম নয়, বরং উপাধি।

ইমাম সাহেবের ডাক নাম

ইমাম সাহেবের আসল নাম নো'মান। কিন্তু তিনি আবু হানিফা নামেই সমধিক পরিচিত। আবু হানিফা তাঁহার ডাক নাম। নামের অর্থের প্রতি খেয়াল করিলে মনে হয়, হানিফা নামে তাঁহার কোন সন্তান ছিল এবং তিনি তাঁহার পিতা। কিন্তু প্রকৃত সত্য ইহার বিপরীত। হানিফা নামে তাঁহার কোন সন্তান ছিল না। পাক কালাম মজীদে বর্ণিত "হানিফা" শব্দটির প্রতি প্রবল অনুরাগ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি উহার সহিত 'আবু' শব্দটি জুড়িয়া দিয়া 'আবু হানিফা' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিক্ষার প্রতি ইমাম সাহেবের অনুপ্রেরণা

হিজরী নব্বই দশকে উমাইয়া খলিফা সোলায়মান বিন আবদুল মালেক তখন খেলাফতের আসনে সমাসীন। পূর্ব খলিফা ওলীদ ও হাজ্জাজের শাসনামলে আলেম সমাজের প্রতি নির্যাতন চলিতে থাকায় এলমে দ্বীন চর্চার ক্ষেত্রে যে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল, তিনি তাহা দূর করিয়া উহাকে আরও ব্যাপক ও সার্বজনীন করিয়া তুলিয়াছিলেন; যা'র জন্য ইমাম সাহেবের অন্তরেও এলমে দ্বীন শিক্ষার আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত পৈতৃক ব্যবসা নিয়া তাহাকে অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকিতে হইত, এইজন্য মনের আশা মনেই রহিয়া গিয়াছিল। উহা আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু একদিনের ঘটনা-

ইমাম সাহেব বাজারে যাইতেছিলেন। পথে এক বোযর্গের সাথে তাঁহার দেখা। বোযর্গের নাম ইমাম শা'বী। তিনি কুফার একজন বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। ইমাম শা'বী তাঁহাকে দেখিয়া মনে করিলেন, হয়ত বা কোন তালেবে এলম মাদ্রাসায় যাইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছ বাছা? ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, বাজারে অমুক সওদাগরের নিকট যাইতেছি। ইমাম শা'বী বলিলেন, আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। আমি জানিতে চাই, তুমি কোথায় পড় এবং কার কাছে পড়? একথার উত্তরে ইমাম সাহেব খুব লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, আমি পড়াশুনা করি না। ইমাম শা'বী বলিলেন, খুবই খারাপ কথা। তোমার চেহারায় এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে; তুমি আলেমদের সংস্পর্শ গ্রহণ কর।

ইমাম শা'বীর এই মধুমাখা তিরস্কার ও নসীহত ইমাম সাহেবের অন্তরে দারুণ ভাবাবেগ জাগাইয়া তুলিল। তিনি এলমে দ্বীন শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। ঐ সময় শিক্ষার বিষয়বস্তু যাহা ছিল তাহা হইলঃ- আদব, আন্‌ছাব, আরব-ইতিহাস, হাদীছ, কালাম- ইত্যাদি। কালাম শাস্ত্রও আজকালকার কালাম শাস্ত্রের মত ছিল না। কারণ তখনও উহার উপর দর্শন ছায়াপাত করিতে পারে নাই। যুগের চাহিদা অনুযায়ী যতটুকু জিজ্ঞাসার জবাব দান করা দরকার ছিল, ততটুকু শুধু উহাতে সন্নিবেশিত ছিল। অতিরিক্ত কিছুই ছিল না।

ইলমে কালামের প্রতি ইমাম সাহেবের মনোযোগ

পরবর্তীকালে ইলমে কালাম যদিও অনেকটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া একটি স্বতন্ত্র বিষয়ে পরিণত হয় এবং পাঠ্য তালিকায় স্থান লাভ করে- তবুও উহা শিক্ষা করিবার জন্য তখন স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ধর্মীয় জ্ঞান গরিমাকে যথেষ্ট মনে করা হইত। আল্লাহপাক এই দিক দিয়া ইমাম আবু হানিফাকে যথেষ্ট জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার ধমনীতে ইরানী রক্ত প্রবাহিত ছিল। তদুপরি তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। ধর্মীয় বিবরণ ও মাছলা মাছায়েল কুফায় এত বহুল প্রচারিত ছিল যে, অতি সাধারণ একজন লোকও কোন শিক্ষিত লোকের সাথে উঠা বসা করিয়া অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারিত। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এই শাস্ত্রে এতই পারদর্শী ছিলেন যে, তাঁহার ওস্তাদগণও এ বিষয়ে তাঁহার সহিত তর্ক করিতে সংকোচ বোধ করিতেন। ব্যবসায়ের খাতিরে মাঝে মাঝে তাঁহাকে বসরা যাইতে হইত। বসরাতেই ছিল ঐ সকল দলের কেন্দ্র। বিশেষভাবে খারেজীরা সেখানে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছিল। ইমাম সাহেব তাহাদের সহিত বহুবার বাহাছ করিয়াছিলেন। আবাজিয়া, সিগরিয়া, হাশরিয়া প্রভৃতি দলের সাথেও তাঁহার বাহাছ হইয়াছিল। যতবারই তিনি বাহাছ করিয়াছেন- ততবারই জয়লাভ করিয়াছেন। কোন দলই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। বরং তাহারাই প্রত্যেকবার তাঁহার নিকট পরাজয় বরণ করিয়াছে।

বেশ কিছুকাল এভাবে তর্কবিতর্ক করিয়া পরিশেষে ইমাম সাহেব ইলমে ফেকাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। অবশিষ্ট জীবন তিনি ফেকাহ শাস্ত্রে গবেষণা করিয়াই কাটাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বাহাছ করিয়া প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার যে অভ্যাস তাঁহার গড়িয়া উঠিয়াছিল, জীবন কাল পর্যন্ত তিনি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

চলবে

বরযখ (রাবিতা)

হযরতুল আল্লামা আবদুল হাকিম আরওয়াসী (তুরস্ক)

অনুবাদঃ কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীতে গুণান্বিত ও মুশাহাদার পর্যায়ে উন্নীত একজন ওলীর সঙ্গে নিজ হৃদয় সংশ্লিষ্ট করাকে এবং তাঁর উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতিতে তাঁর চেহারা মোবারক স্মরণ করাকেই রাবেতা বা বরযখ বলে। এটাকে তাসাব্বুরে শেখও বলা হয়। পূর্ণতা অর্জনকারীদের সম্পর্কে চিন্তা করা খুবই উপকারী বটে, যা হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে- আউলিয়াকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, এবং যারা আউলিয়াদের সঙ্গে থাকে তারা (আল্লাহর বিরুদ্ধে) বিদ্রোহী হয় না [বুখারী ও মুসলিম]। ঐ ধরনের একজন আল্লাহওয়ালার কথা চিন্তা করেই তাঁর গুণাবলী এবং হালসমূহ অর্জন করে থাকেন একজন বিশ্বাসী ও প্রকৃত মুসলিম। হাদীসগুলো মুসলিমদেরকে আদেশ দেয়- পরহেযগার বুজুর্গ- তথা ওলী আল্লাহদের সঙ্গে থাকতে। দায়লামী ও তাব্‌রানী বর্ণিত এবং কানযুদ দাকাইক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ একটি হাদিস ঘোষণা করে-اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا-

অর্থাৎ, "আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী (কঃ) তার সিংহ দরজা' (হাদীস)। হাদীসটির ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ ওয়ালাগণ- যাঁরা আল্লাহ্ পাকের ফয়েযের অসীম সাগরের দ্বারস্বরূপ বিরাজমান- তাঁদের কলবসমূহ হতেও ফয়েয, মা'রেফত ও নূর তাদের স্মরণকারী ও তাঁদের প্রতি মহব্বত পোষণকারী মুসলিমদের কলবে (হৃদয়ে) প্রবাহিত হয়। এই ফয়েয অর্জন করতে হলে প্রথমতঃ আহলে সুন্নাতের আকিদা-বিশ্বাসকে ধারণ করতে হবে এবং শরিয়তকে সম্পূর্ণভাবে মান্য করতে হবে, আর আল্লাহ্ ওয়ালাদেরকে ভালবাসতে হবে। যেহেতু ওহাবীরা এ সকল পূর্ব শর্ত পূরণ করতে অক্ষম, সেহেতু তারা আল্লাহওয়ালাদের ফয়েয ও মা'রেফত হতে বঞ্চিত হয়ে আছে। তারা যা জানেনা, সেগুলোকে অস্বীকার করা ছাড়া তাদের আর কোনো গত্যন্তর নেই। ফয়েয প্রাপ্তির জন্য দ্বিতীয় যে জিনিটি জরুরী, তা হলো মুর্শিদকে অবশ্য অবশ্যই রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রকৃত ওয়ারিস, তাঁরই পদাংক অনুসারী ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে হবে। যেহেতু ওহাবীদের মধ্যে কোনো আল্লাহওয়ালা নেই, সেহেতু ফয়েয ও মারেফাতের দ্বার তাদের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ কারণেই মূর্তিপূজারী মুশরিকরা এবং ভণ্ডপীর ও অজ্ঞ লোকদের অনুগামী হতভাগা মুসলমানেরা কোনো ফয়েয বা উপকার লাভ করতে পারে না। আবু জাহেল ও আবু লাহাবের মত লোকদের দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ফয়েয বা হেদায়েত লাভ না করার কারণটি হলো- তারা প্রথম শর্তটি পূরণ করতে পারেনি। নবীগণ (আঃ) হলেন দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তায়ালার খলিফা বা প্রতিনিধি। আর যেহেতু আউলিয়াগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী, সেহেতু তাঁরাও এ সম্মানের একটি অংশ পেয়েছেন এবং তাদের হৃদয়গুলোও তাই আল্লাহ তায়ালার আয়নায় পরিণত হয়েছে। সুরা সোয়াদের ২৬ আয়াত ও সুরা আনআমের ১৬৫ আয়াত এবং আরও বহু আয়াত আমাদের কথাকে সমর্থন দেয়।

একজন কামেল (পূর্ণতা প্রাপ্ত) ওলীর হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় সংশ্লিষ্টকারী মুসলমান সেই ওলীর নেয়ামতপূর্ণ হৃদয়ের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার ফয়েয অর্জন করতে সক্ষম হবেন। দায়লামীর কেতাব ও কানযুদ দাকাইক গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি বর্ণনা ঘোষণা করে যে,

اَلشَّيْخُ فِىْ قَوْمِهٖ كَالنَّبِىِّ فِىْ اُمَّتِهٖ-

অর্থাৎ, "একজন পীর তাঁর অনুসারী ও সিলসিলাধারী-এর জন্য সেই রকম হেদায়েতকারী, যে রকম একজন নবী (আঃ) তাঁর উম্মতের জন্য হেদায়েতকারী [হাদীস]। আল্লাহওয়ালা বেসাল প্রাপ্ত হলেও কলব কর্তৃক ফয়েয ও মারেফত বিতরণে কোনো রকম পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। তাঁর কামালাত বা পূর্ণতা কখনোই তাঁর রূহকে ত্যাগ করেনা। আর রূহ তো স্থান কাল, জীবন-মৃত্যু দ্বারা আবদ্ধ নয়। যদি উপরোল্লিখিত শর্ত দুইটি পূরণ করা যায়, তাহলে একজন

আল্লাহওয়ালার সঙ্গে হৃদয় সংশ্লিষ্টকারী মুসলিম অবিলম্বে ফয়েজ ও মারেফত অর্জন করবেন। সেই ওলী ব্যক্তি যেখানেই থাকুন অথবা জীবিত কিংবা বেসাল প্রাপ্ত হোন-তাতে কিছুই আসে যায়না। এটা বিশ্বাস করা জরুরী যে, "তাঁদের রুহানী তাসাররূফ (কর্মক্ষমতা) প্রকৃতপক্ষে তাঁদের উপর আল্লাহ তায়ালার তাসাররূফ দ্বারাই সংঘটিত হয়।"

যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষ সরাসরি আল্লাহ তায়ালার ফয়েয গ্রহণ করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন একজন মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন, যাঁকে আল্লাহপাক ভালোবাসেন এবং যিনি ফয়েয গ্রহণ ও বিচ্ছুরণ করতে সক্ষম। তিনিই মুর্শিদ ও পথ প্রদর্শক।

২০০ হিজরী হতে ১২০০ হিজরী পর্যন্ত বুখারা, খিবা, সমরকন্দ ও ভারতের উলামাবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে রাবেতা বা তাসাববুরে শেখ স্বীকৃতি দিয়ে তা পালন করেছেন এবং নিজেদের শিষ্যদেরকে তা পালন করতে আদেশ দিয়েছেন। সেটাই হলো আমাদের উপরোক্ত কথার সর্বোৎকৃষ্ট সমর্থনসূচক দলিল। এ দলিলের বদলে আরেকটি দলিল তালাশ করার অর্থ হবে- বিশাল এশিয়া মহাদেশে গত এক হাজার বছর ধরে আগত শত সহস্র ইসলামী ওলামার কুৎসা রটনা করা। তাঁদের বইপত্র পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা উলামা ছিলেন এবং আরও প্রতীয়মান হয় যে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই আউলিয়া ছিলেন।

সুরা মায়েদার ৩৮ নং আয়াত ঘোষণা করে-

وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ-

অর্থাৎ 'আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য ওয়াসিলা বা মাধ্যম তালাশ কর'। এ আদেশসূচক আয়াতটিতে ওয়াসিলাটি কোনো শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। বরং সার্বিক অর্থে ব্যবহৃত এবাদত, যিকির, দোয়া ও আউলিয়াগণের রূহ সমূহও এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।)

("ওয়াসিলা" আসলে নেক আমল বা পরহেযগারী নয়। বরং- এটা সহিহ বুখারীতে উদ্ধৃত হযরত ওমর (রাঃ) এর দোয়া দ্বারা-বুযর্গানে দ্বীন বলে সিদ্ধ প্রমাণিত। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আব্বাসকে উসিলা করেছিলেন।)

এই সার্বিক আদেশটিকে ইবাদতে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করাটা আসলে আয়াতটির প্রতি কুৎসা রটনা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওয়াসিলা যে প্রকৃতপক্ষে রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- তা সুরা আলে ইমরানের ৩১ নং আয়াতে বর্ণিত ঐশী আদেশে জ্ঞাত করানো হয়েছে-

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ-

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, আলে ইমরান। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে, তার উচিৎ এ আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করা।'উলামাগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী'- এই হাদিসটি পরিস্ফুট করে যে, আউলিয়াগণও ওয়াসিলা। আর ভালোবাসা ছাড়া 'এত্তেবা বা অনুসরণ কর' কুরআনের এই আদেশটি মান্য করা একেবারেই অসম্ভব। (সুতরাং নবী ও ওলীর অনুসরণ করতে হবে ভালবাসার মাধ্যমে।

ইমাম বুখারী লিখেছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্ক হতে দূরে ছিলেন না, যার ফলে তিনি আরয করেছিলেন যে, এমন কি গোসলখানায়ও তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মোবারককে তাঁর স্মৃতি পটে দেখতে পেতেন। ইহাই রাতেবা বা তাসাব্বুর।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ-

অর্থাৎ- "হে বিশ্বাসীরা, তোমরা মুত্তাকী (পরহেযগার, খোদা ভীরু) হও এবং সত্যনিষ্ঠ (আউলিয়া)দের সঙ্গে থাক' (সুরা তওবা ১২০ আয়াত)। এক্ষেত্রেও 'সঙ্গে থাক' বাক্যটি কোনো শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এটা একটা সার্বিক মন্তব্য। অতএব, সত্যনিষ্ঠদের 'সঙ্গে থাকার' মধ্যে শারিরীক ও আত্মিক- উভয় অবস্থায় থাকাই অন্তর্ভুক্ত। শারীরিক বা বস্তগতভাবে থাকার অর্থ হচ্ছে- তাঁদের উপস্থিতিতে (হুযুরে) বিনয়, আদব ও মহব্বত সহকারে অবস্থান করা। আর আত্মিকভাবে থাকার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কোন একজন প্রিয়

ও সত্যনিষ্ঠ বান্দাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা। ইহাই তাসাব্বুর।

সুরা ইউসুফের ২৪ নং আয়াত ঘোষণা করে -

لَوْ لاَ اَنْ رَاى بُرْهَانَ رَبِّهٖ

অর্থাৎঃ যদি না তিনি (ইউসুফ আঃ) তাঁর প্রভুর প্রমাণ দেখতেন।

ঐ প্রমাণটি হলো- হযরত এয়াকুব (আঃ)-এর দর্শন। তাফসীরে কাশশাফের প্রণেতা আল যামাখশারী- যদিও তিনি একজন গোমরাহ মুতাযিলা ছিলেন- তিনিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসীরীনদের সঙ্গে সমর্থন দিয়ে বলেছেন যে, কেনানে অবস্থানকারী হযরত এয়াকুব (আঃ) মিশরের একটি বালাখানায় যুলাইখার দ্বারা আবদ্ধ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সামনে দৃশ্যমান হয়েছিলেন। 'আশবাহ গ্রন্থটির ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ রচয়িতা হানাফী আলেম হযরত আহমদ হামাবী তাঁর কৃত 'নাফাখাত আল কুরব ওয়াল ইততিসাল বে ইসবাতিত তাসাররুফী লি আউলিয়াইল্লাহী তা'লা ওয়াল কারামাতি বাদল ইনতিকাল' পুস্তকটিতে লিখেছেন যে আউলিয়ার রূহানিয়াত বা আধ্যাত্মিক শক্তি তাদের জিসমানিয়াত বা শারীরিক অস্তিত্ব থেকেও অধিক ক্ষমতাশালী, আর তাদেরকে একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যেতে পারে। তিনি তাঁর কথার স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করেন

"কিছু লোক বেহেশতের প্রত্যেকটি দরজা দিয়েই বেহেশতে যাবে। প্রত্যেক দরজাই তাদেরকে আহবান করবে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! এমন কোন ব্যক্তি কি থাকবেন, যিনি আটটি দরজার প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন? হুজুর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন ঃ 'আমি আশা করি- তুমি তাদের মধ্যে একজন হবে" (হাদীস)।

যখন কোনো ব্যক্তির রূহ্ (আত্মা) আলমে আমর'-এ অবস্থিত তাঁর মৌলিক মাক্বাম বা মর্যাদাপূর্ণ স্থানে উন্নীত হন, তখনই তাঁকে একই মুহূর্তে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যেতে পারে। যেহেতু মানুষের ইন্তেকালের পরে দুনিয়ার মোহ তাঁর রূহ হতে তিরোহিত হয়, সেহেতু তাঁর রূহ আরও শক্তিশালী হয়ে যায়। ফলে, একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় দৃশ্যমান হওয়া তাঁর পক্ষে সহজতর হয়।

ইবনে হাজার মক্কী কৃত শামাইল গ্রন্থের শরাহ্তে এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রণীত তানভীরুল হালাক পুস্তকটিতে লিপিবদ্ধ আছে যে- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখি। তিনি আমার প্রতি কৃপাপূর্ণ আচরণ করেন। আমি জেগে ওঠার পর তাঁর একজন স্ত্রীর (নিজ খালা) সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। অতঃপর আয়নায় মুখ দেখতে যেয়ে নিজের চেহারার পরিবর্তে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখতে পাই।" এই হাল বা অবস্থাটি রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাস (নির্দিষ্ট) নয়। কারণ, ইসলামী উলামাবৃন্দ তাঁদের বইপত্র সমূহে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাসাইস (নির্দিষ্ট গুণাবলী) সংগ্রহ করেছেন এবং এই হালটিকে একটি খাসাইস হিসেবে চিহ্নিত করেননি। ফিকহ এবং উসুলে ফিকহ-এর মৌলিক আইন কানুন অনুযায়ী রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের উলামা তথা আউলিয়াগণ তাঁর খাসাইস ভিন্ন অন্যান্য প্রত্যেকটি হালের উত্তরাধিকারী হতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে নামাযের মধ্যে কথা বল্লে কারও নামায ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এ গুণটি কেবল মাত্র নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্যই সুনির্দিষ্ট। সুতরাং উলামা কেরাম তথা আউলিয়াগণের সঙ্গে কথা বল্লে নামায ভেঙ্গে যাবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামনে হাযির জেনে তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম সম্ভাষণ জানানো তাঁর কোনো নির্দিষ্ট খাসাইস নয়। অতএব, একজন ওলীর চেহারা মোবারককে খেয়াল করে তাঁর রূহ হতে সাহায্য কামনা করা বৈধ। ওলীয়ে কামেল নিজ মুরিদের দিলের আয়নায় দেখা দিতে পারেন। শাফেয়ী আলেম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) তাঁর রচিত আত তাবাকাতুল কুবরা' নামক গ্রন্থে বলেন, অলীগণের অন্যতম কারামাত হচ্ছে এই যে, আউলিয়াগণ বিভিন্ন আকৃতিতে দৃশ্যমান হতে পারেন। সুরা মরিয়মের ১৭ নং আয়াত ঘোষণা করে-

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا-

অর্থাৎ- 'তিনি (জিবরীল আঃ) মরিয়মের সামনে পরিপূর্ণ মানব আকৃতিতে দৃশ্যমান হন'। উলামায়ে কেরাম এ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আউলিয়ায়ে কেরামের রূহসমূহ বিভিন্ন আকৃতিতে দৃশ্যমান হতে পারেন। কাদিবুল বান হাসান আল মুসুলী (ইন্তেকাল ৫৭০ হিজরী, মুসেল)-এর সর্বজন বিদিত ঘটনাটি এই ধরণের

একটি কারামত। আল মুসেলীর এই কারামত এবং অন্যান্য কারামত সম্পর্কে জানতে হলে ইউসুফ নাবহানীর- জামেউল কারামত আল আউলিয়া, পুস্তকটি পড়ুন। শাফেয়ী আলেম আল্লামা আল জায়লী তাঁর রচিত শরহে বুখারী পুস্তকে লিখেছেন, প্রকৃত আউলিয়া-যারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরাধিকারী, তাঁদের চেহারাও শয়তান ধারণ করতে পারে না, যেমনিভাবে পারে না নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মোবারক ধারণ করতে।

হানাফী আলেম সাইয়েদ শরীফ আল জুরজানী তাঁর কৃত শরহে মাতালীর ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে এবং শরহে মাওয়াকিফ পুস্তকের শেষে তিয়াত্তরটি মুসলিম সম্প্রদায়ের তালিকা প্রদানের আগে বলেন যে, জীবিত কিংবা বেসাল প্রাপ্ত আউলিয়াগণ তাঁদের শিষ্যদের কাছে বিভিন্ন আকৃতিতে দৃশ্যমান হতে পারেন এবং তাঁদের শিষ্যগণ (মুরীদগণ) ঐ সকল আকৃতি থেকে অশেষ ফয়েজ ও উপকার পেতে পারেন।

মালেকী আলেম তাজুদ্দিন আহমদ ইবনে আতা-আল্লাহ্ আল ইসকান্দরী তাঁর প্রণীত তাজিয়্যা গ্রন্থে লিখেছেন যে, কোনো ব্যক্তি তখনই অনেক উপকার পেয়ে থাকেন, যখন তিনি কোনো প্রকৃত ওলীকে দেখেন বা তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করেন।

হানাফী আলেম আল্লামা শামসুদ্দিন ইবনে নুয়াইম তাঁর কিতাবুর রূহ পুস্তকটিতে বলেন, "রূহ সমূহ যখন নিজেদের দেহের বাইরে থাকে, তখন বিভিন্ন হালে থাকতে পারে। আউলিয়াগণের রূহ সমূহ রাফিক আল আ'লা নামক স্থানে অবস্থানরত এবং তাঁরা তাঁদের বেসালপ্রাপ্ত দেহের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত আছেন। যদি কোনো ব্যক্তি এ রকম একজন ওলীর মাযার যেয়ারত করে তাঁকে সম্বাষণ জানায়, তবে রফিক আল আ'লায় অবস্থিত তাঁর রূহ মোবারক ব্যক্তিটিকে "প্রত্যুত্তর দেন।' এটা ইমাম সুয়ুতীর কিতাবুল মুনজালী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এ সকল প্রমাণসমূহ পরিস্ফুট করে যে, আউলিয়াগণ তাঁদের বেসালের পরও ভীষণ শক্তিশালী তাসাররুফ (কর্মক্ষমতা) এবং প্রভাবের অধিকারী, যা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

(উল্লেখ্য যে, রূহ তিন প্রকার। জিসমানী, রূহানী ও সুলতানী। শেষের দুটি দেহ ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থানে গমন করতে পারে। যেমন- ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন যোগে বিভিন্ন স্থানে নিজেকে দেখা।)

মালেকী আলেম ও মুখতাসার বইটির প্রণেতা খলিল ইবনে ইসহাক আল জান্দী বলেন, 'বিভিন্ন আকৃতিতে দৃশ্যমান হওয়ার সামর্থ্য তখনই আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কোনো ওলীকে প্রদান করা হয়, যখন তিনি পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হন। এটা অসম্ভব কিছু নয়। কারণ, দৃশ্যমান বিভিন্ন আকৃতিগুলো আসলে বস্তুগত জিসম (দেহ) নয়। রূহসমূহ কোনো বস্তু নয় এবং এগুলো মহাশূন্যে কোনো জায়গা দখল করে থাকে না।

শরীয়তের জ্ঞান বিশারদ তথা ওলীর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত শরীয়তের শিক্ষা ও দলিল পত্র সমূহে অবিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ হলো শরীয়ত এবং যুক্তির সঙ্গে মতভেদ সৃষ্টি করা। সুন্নী মুসলিমদের এ বিশ্বাসটির জন্য তাঁদেরকে মুশরিক (কাফের) আখ্যা দানকারী ওহাবীদের উপর যেন আল্লাহ তায়ালা যুক্তি ও ন্যায় বিচারের ক্ষমতা নাযেল করেন। ওহাবীরা, যারা বিষয়টিতে বিশ্বাস স্থাপনকারী মুসলিম জনগণকে মুর্তি পূজারী ও মূর্তিকে স্রষ্টা জ্ঞানকারী কাফেরদের সমতুল্য বানাতে চায়, তাদের প্রতি ধিক! মালেকী মযহাবের আলেম ও কাদেরীয়া তরীকার একজন বিশিষ্ট পথিক- যিনি সুলতানুল আশেকীন (খোদা প্রেমিকগণের রাজা) হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং যাঁর হৃদয় রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ওয়ারিস তথা আউলিয়াগণের ভালবাসায় প্রজ্জলিত ছিল- তিনি তাঁর বিখ্যাত কাসিদা 'খামরিয়া'-তে তাসাউফের পূর্ববর্তী জ্ঞানবিশারদগণের মর্যাদার যথাযথ গুণকীর্তন করেছেন। যে সব গুমরাহ্কে আখেরাতে গোমরাহ ও আযাব ভোগকারী হিসেবে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে যত ভাল করেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহকারে বোঝানো হোক আর যতগুলো প্রামাণ্য দলিল অথবা কারামতই প্রদর্শণ করা হোক, তারা মুমিন হওয়ার নেয়ামত অর্জন করতে পারবে না। হযরত মওলানা আবদুর রহমান জামী (রহঃ) তাদেরকে নিম্নোক্ত চারটি পংক্তিতে যথাবিহিত জওয়াব দিচ্ছেন- যার অর্থ হলো-"বিশ্বের সিংহরা সবাই একই শৃঙ্খলের সংযোগ মাত্র, কীভাবে একটি শেয়াল তার দুঃসাহস ভরা ধূর্ততা দ্বারা তা ছিন্ন করবে? যদি কোনো গোমরাহ লোক আউলিয়াকে করে সমালোচনা, তবুও তাঁরা নির্মল থাকেন, কেবল সেই প্রমাণিত হয় খারাপ মনা"।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত প্রদীপকে ফু দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, শুধুমাত্র তার দাড়িতেই আগুন ধরে যাবে।'। (আল্লামা সাইয়েদ আবদুল হাকিম আরওয়াসী কৃত রাবিতায়ে শরীফা, ইস্তাম্বুল ১৩৪২ হিজরী, ১৯২৪ ইং হতে।)

সংশোধন

সুন্নী বার্তা ২২ নং বুলেটিনের ১৭ পৃষ্ঠায় ২২ নং লাইনে "ভুল ভিত্তি" ছাপা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে ১৯ পৃষ্ঠায় নীচ থেকে উপরের দিকে তৃতীয় লাইনে "এবং "এবং সাত দরজা" ছাপা হয়েছে। এতে অর্থের বিপর্যয় হয়েছে। শুদ্ধ হবে যথা ক্রমে "মূল ভিত্তি" ও "এবং দোজখের সাত দরজা"। অনিচ্ছাকৃত এই ভুল ছাপার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।- সম্পাদক

ইসলামে তাসাউফের গুরুত্ব

মাওলানা আবু তাহের মোঃ নূরুল আলম

তাসাউফ কী এবং কেন- এতদসংক্রান্ত সকল ব্যাখ্যা সুফীগণের সংজ্ঞাতেই উপলব্ধি করা যায়, যাঁদের বক্তব্য ছিল অকাট্য এবং সত্যের নিরিখে, যাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল সর্বজন স্বীকৃত।

হজরত খাজা মারূফ কারাখী (রাঃ) (বেসাল ২০০ হিঃ)-এর মতে বাস্তবকে গ্রহণ করা, সুক্ষ্ম জ্ঞানের উপর আলোচনা করা এবং পার্থিব মোহ থেকে বিমুখ হওয়ার নামই হচ্ছে তাসাউফ।

হযরত সহল বিন আবদুল্লাহ তশতরী (বেসাল ২৮৩ হিঃ) -এর বর্ণনা মতে, সুফী সে ব্যক্তি- যাঁর অন্তর পার্থিব বস্তু হতে কলুষমুক্ত এবং সদা ধ্যানমগ্ন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে মানব জাতি থেকে সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং স্বর্ণও যাদের দৃষ্টিতে মৃত্তিকা সমতুল্য।

হযরত খাজা জোনায়েদ বাগদাদী (রঃ) সুফীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "সুফী তিনি হবেন- যাঁর অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে সংসারের প্রতি আসক্তিহীন। আর আল্লাহর আদেশ পালনে যিনি সদা ব্যাকুলচিত্ত। আত্মনিবেদনে তিনি হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর অনুসারী হবেন। তিনি অনুসারী হবেন অনুশোচনায় হযরত দাউদ (আঃ)-র, আগ্রহ উদ্দীপনায় হযরত মুসা (আঃ) -এর, আর চরিত্র মাধুর্যে তিনি হবেন হযরত নবী করিম (দঃ)-এর অনুসারী।"

উল্লেখিত সংজ্ঞা সমূহের মধ্যে শব্দগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে অভিন্ন রূপই অনুমিত হয়। সূফী দর্শনের ইমাম হযরত শেখ শেহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (বেসাল- ৬৩২ হিঃ) স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আওয়ারিফুল মা'আরেফ' -এর মধ্যে সূফীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিপিবদ্ধ করেন, "হযরত শেখ আবদুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ (রঃ) -এর নিকট কোন ব্যক্তি সুফী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে প্রতি উত্তরে তিনি বলেন, আমার মতে সেই ব্যক্তি সুফী- যিনি রসুলে করিম (দঃ) -এর সুন্নাতের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, আর সমগ্র হৃদয় দিয়ে তাঁরই প্রতি মনোনিবিষ্ট থাকেন, আর স্বীয় কু- প্রবৃত্তির অত্যাচার থেকে নিজকে রক্ষা করাব মানসে তাঁর অনুকরণীয় ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকেন।" হযরত ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে সানি শেখ আহমদ ফারুকী সরহিন্দী (বেসাল ১০৩৬ হিঃ) স্বীয় মাকতুবাত শরীফের মধ্যে সূফী শাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। শরিয়ত ও তরিকত যে মূলতঃ এক, প্রধমার্ধের ৩৬ নং মাকতুবে তাই বর্ণিত হয়েছে- "শরিয়তের তিনটি অংশ রয়েছে। যথা (১) এতেকাদ (২) আমল (৩) এখলাছ। যতক্ষণ না মুসলিম জীবনে উল্লেখিত তিনটি অংশের সমন্বয় সাধিত হবে, ততক্ষণ শরিয়তও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর যখন শরিয়তে (ঐ তিনটিতে) পরিপূর্ণতা লাভ করবে- তখন আল্লাহর সন্তুষ্টি অবধারিত হয়ে পড়বে- যা পার্থিব ও পার-লৌকিক সফলতার মূল।

যেমন পবিত্র কোরানে করিমে উল্লেখ রয়েছে-

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ

অর্থাৎ- "আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড় সফলতা।" (সুরা হাদিদ) সুতরাং বুঝা যায়– শরিয়তই হচ্ছে ইহ ও পরকালের সাফল্যের চাবিকাঠি। এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি শরীয়ত ছাড়া অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী নন বরং তরিকত ও হাকীকতের ভূষণে সুফী সাধকগণ বিভূষিত। উভয়টিই শরিয়তের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর বা অংশ বিশেষ। কাজেই তরিকত অর্জন করার জন্য শরীয়তের পূর্ণতা বিধান করা অপরিহার্য। ইমাম রব্বানী (রঃ) অন্য একটি মাকতুবে এরূপ বর্ণনা দেনঃ শরীয়তের দুইটি রূপ রয়েছে। একটি বাহ্যিক রূপ, দ্বিতীয়টি আত্মিক রূপ। বাহ্যিক আকৃতি ওটা- যা শরিয়তের আলেমগণ বর্ণনা করে থাকেন, আর আত্মিক বা প্রকৃত রূপ ওটা- যদ্বারা সূফী সম্প্রদায় বিভূষিত।

তরিকত দর্শন সম্বন্ধে যখন সর্বজন সমাদৃত শ্রদ্ধাভাজন সুফী সম্প্রদায়ের উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে- তখন সে সব স্বঘোষিত জ্ঞানী-যারা সূফী দর্শনকে অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণার সমষ্টি হিসেবে গণ্য করে থাকে, তাদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, পরিপূর্ণ রূপে খোদাগত প্রাণ হওয়া, তাঁর প্রত্যেকটি আদেশ মান্য করা এবং তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য ইহলৌকিক যাবতীয় সুখ-শান্তি তুচ্ছ জ্ঞান করা, সাথে সাথে মহানবী (দঃ)-কে মনে প্রাণে ভালবাসা-এ সমুদয় গুণাবলী যদি অনৈসলামিক হয়ে থাকে, তবে ইসলামের জন্য কী শিক্ষা রয়েছে– যাকে আমরা ইসলাম বলতে পারি? শুধু কি তাই? উল্লেখিত সুফী সাধকগণের ব্যক্তিত্ব ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতার উজ্জ্বল প্রমাণ নয় কি? আর যদি এ সমালোচকগণ ইসলামের এহেন শিক্ষাকে অনৈসলামিক বলে আখ্যায়িত করতে চায়, তবে সেটা শুধুমাত্র ইসলামের মহত্বকে ক্ষুন্ন করার অপপ্রয়াস ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। বর্তমানে কোন কোন মহল থেকে এমনও সমালোচনা হতে দেখা যায়- যারা তাছাউফকে খৃষ্টান বৈরাগী এবং হিন্দু যোগীদের যোগ সাধনার ফসল বলে মনে করে থাকে।

যেমন- ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন-মুওদুদী। তাছাউফের সমালোচনাকারীরা সমালোচনার বিষয় হিসেবে পেয়ে থাকে সুফীবৃন্দের চিল্লা, এবাদত, রেয়াজতের মাধ্যমে খানকা সমূহে একাকী অবস্থান প্রভৃতি। মুলতঃ তারা ভ্রান্তিতে রয়েছে এ মর্মে যে, নিছক এ ব্যাপারগুলিই বুঝি সুফী তত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। একজন কামিল পীর স্বীয় মুরীদকে সে ক্ষেত্রেই চিল্লা করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, যে ক্ষেত্রে মুরীদ পার্থিব ব্যস্ততায় লিপ্ত থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, কিছু দিনের জন্যে হলেও যেন মুরীদ আল্লাহর জিকির আর ধ্যানে সময় অতিবাহিত করতে পারে। আর এই চিল্লার দ্বারা যখন মুরীদ স্বীয় চরিত্রকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহর আদেশ পালন যখন তার সহজাত প্রকৃতি ও মজ্জাগত স্বভাবে রূপান্তরিত হয়- তখন ইসলামী দৃষ্টিতে তার জীবনের উদ্দেশ্য সফলতায় পর্যবসিত হয়। এর অর্থ এই নয় যে, চিল্লা, ইবাদত, রিয়াযত দ্বারা সে সমস্ত জীবনই সংসার বিরাগী হিসাবে অতিবাহিত করবে। বরং তরিকতের লক্ষ্য হচ্ছে- শরীয়তের সীমারেখায় মানুষকে স্বভাবগত ভাবে চলার উপযোগী করে তোলা। সুফী দর্শন বা তরিকত সম্বন্ধীয় পীর মুরীদি ইসলামের কোন নতুন সংযোজন বলে ধারণা করা বাতুলতার নামান্তর। এটা কোন বিজাতীয় প্রভাবও নয়- যেমন কিছু কিছু ভ্রান্ত লোক বলে থাকে। নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামদের নিকট থেকে বাইআত নিয়েছিলেন। যুগে যুগে বিশ্ব বরেণ্য আলেমদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাঁরা বাহ্যিক ইলম অর্জনের পর মুর্শিদে কামিলের অন্বেষণে দেশ হতে দেশান্তরে, শহরে, নগরে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁরা যখনই কোন কামিল ওলীর সন্ধান পেতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করতেন। আর কিছুদিন হলেও অন্ততঃ তাঁর খানকায় অবস্থান পূর্বক আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করে নিতেন। যখন তাঁর মন-মানসিকতায় পরিশুদ্ধি আসতো, তখন তাঁকে অন্য অঞ্চলে পথভোলা মানুষের হেদায়তের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হতো। আর তাঁদের রূহানী প্রভাবে হাজার হাজার মানুষ চরিত্র সংশোধনে সক্ষম হতো। কাজেই চিল্লা, ইবাদত, রিয়াযত-এ গুলো একান্ত ইসলামী রেয়াযত। খৃষ্টান বৈরাগ্য বা প্রাচ্যের হিন্দু দর্শনের প্রভাব নয়। যাঁরা এসব ভ্রমে আজো কালাতিপাত করছেন, তাঁদের উচিত হবে পূর্ববর্তী আউলিয়া কেরামের জীবনী অধ্যয়ন করা। যেমন সুলতানুল হিন্দ খাজা সৈয়দ মুঈনুদ্দিন চিশতী (রাঃ) ইলম অর্জনের পর দীর্ঘদিন স্বীয় মুর্শিদে কামেল সুলতানুল আরেফীন হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রাঃ)-এর খানকায় অতিবাহিত করেন। নিঃসন্দেহে তিনি এ সময়গুলো একাকী নীরব সাধনায় রত ছিলেন। আর যখন তার আত্মিক শুদ্ধি অর্জিত হয় এবং ছুলুকের রাস্তা অতিক্রম করে হেদায়াতের মসনদে তিনি অধিষ্ঠিত হন, তখন তাঁর দৃঢ়তা ও সাহসিতকার সামনে মুশরিকদের কিল্লা সমূহ ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। যার উদাহরণ জগতের কোন বিশ্ব বিজয়ীর ক্ষেত্রেও কদাচিৎ দেখা যায় না। রাজপুতনার কেন্দ্রীয় রাজধানী আজমীরে এসে তিনি যেভাবে খোদায়ী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন- তা কোন পাদ্রী পুরোহিতের পক্ষে সম্ভব ছিল না। উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের পারলৌকিক ভাগ্যের তিনি যে পরিবর্তন সাধন করেন, এ কি ইসলাম বহির্ভূত? এ কি পাদ্রী পুরোহিতদের কাজ ছিল? ইতিহাস প্রমাণ দেবে যে, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রাঃ)-এর নির্দেশে তার অন্যতম খলিফা খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রাঃ) দিল্লীতে চলে যান এবং সেখানেও তিনি ইসলামের আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেন। অতঃপর হযরত কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ) -এর অন্যতম খলিফা হযরত খাজা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর (রঃ) মূলতানের পাক পাঠান নামক স্থানে স্বীয় মুর্শিদের খানকায় রূহানী শিক্ষা লাভ করেন। সেখানকার অজ্ঞতায় নিমজ্জিত তমসাচ্ছন্ন মানুষকে ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলেন।

এমনিভাবে শুধু ভারত বর্ষেই নয়, জগতের বিভিন্ন স্থানে সুফী সাধকগণ দ্বারা ইসলামের যে ব্যাপক উন্নতি ও প্রচার প্রসার তথা বিজয় গৌরব সূচিত হয়েছে- সে সম্পর্কে কিঞ্চিত চিন্তা করলে তাসাউফকে 'নেশা' বলে অবজ্ঞা করা কতটুকু সঙ্গত হবে- তা সাধারণ বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেরই অনুমেয়।

অন্ততঃ মুসলমান নামধারী কোন লোক এরূপ কথা বলতে পারেনা। যাঁরা আজ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য পাগল- তারা কি ঐ ধরনের চরিত্র গঠন করতে পারবেন? বিজয়ীরা করেছেন দেশ জয়- কিন্তু সুফীগণ করেছেন অন্তর জয়।

পড়াইতে চাই

আইডিয়াল, মডেল, সেন্ট্রাল সহ ঢাকা শহরের যে কোন স্কুলের আরবী অতি যত্ন সহকারে গ্যারান্টির সহিত পড়ানো হয় এবং আরবী ভাষা শিক্ষা ও পবিত্র কোরআনের তালিম দেওয়া হয়।

যোগাযোগ ঠিকানা ঃ

মোহাম্মদ আবুল খায়ের

শাহজাহানপুর গাউসুল আজম জামে মসজিদ

বাসা ঃ এ/৩৮/পি- ৪র্থ তলা

শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনী। ঢাকা-১২১৭।

ফোন কাজী অফিস ৯৩৪৭৮৮০ (অনুরোধ)

মৃত ব্যক্তিকে ভাল বলা প্রসঙ্গে

মোহাম্মদ ইব্রাহীম মজুমদার

প্রভাষক, পরশুরাম ফাজিল মাদ্রাসা

মৃত ব্যক্তিকে ভাল বলা জীবিতদের কর্তব্য। এ সম্পর্কে অনেক হাদিছ রয়েছে।

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ مَا وَجَبَتْ فَقَالَ هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِى رِوَايَةٍ اَلْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ

হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন- তারা এক জানাযার নিকট গমন করিয়াছেন। অতঃপর তারা মৃত বক্তির ভাল প্রশংসা করিয়াছেন। তখন নবী করিম (দঃ) বলিলেন- وَجَبَتْ (ওয়াজিব হয়ে গেল)। অতঃপর তারা অন্য এক জানাযার নিকট গমন করলেন। সেখানে তারা মৃত ব্যক্তির মন্দ দিক আলোচনা করলেন। অতঃপর রাসুল (দঃ) বললেন- وَجَبَتْ (ওয়াজিব হয়ে গেল) হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ, وَجَبَتْ এর তাৎপর্য কি? উত্তরে তিনি বললেন- তোমরা যার ভাল প্রশংসা করেছ- তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে এবং তোমরা যার মন্দ দিক উল্লেখ করেছ- তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ। (বুখারী ও মুসলিম) অন্য বর্ণনায় রয়েছে- মুমিনগণ জমিনে আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ।

উল্লেখিত হাদীসে সাহাবায়ে কেরাম মৃত ব্যক্তিকে ভাল মন্দ উভয় বলেছেন দেখে রাসুল (দঃ) একথা এরশাদ করেন। প্রমাণিত হলো যে, মুমিনগণ জমিনে যাকে যা যে প্রথাকে ভাল বলেন- তা ভাল। তাকে বিদ্আত বলা নবীজীর প্রতি অবমাননা। যেমন- মিলাদ ও কিয়াম প্রথা। এই প্রথাকে পূর্ব যুগের উলামাগণ ইজমা বা সর্বসম্মতভাবে উত্তম প্রথা বলেছেন। বর্তমানে যারা ইহাকে বিদ্আত বলে- নিশ্চয়ই তারা উক্ত হাদীস মোতাবেক গোমরাহ।

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِىُّ-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত- রাসুলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করেন- তোমরা মৃত ব্যক্তিদের ভাল দিকগুলো আলোচনা কর এবং তাদের মন্দ দিকগুলোর আলোচনা থেকে বিরত থাক। আবু দাউদ ও তিরমিজি। তিরমিজি।

ইবনে ওমরের বর্ণিত হাদিছে اُذْكُرُوْا ও كُفُّوْا শব্দ দ্বয় امر। অর্থ হচ্ছে- রাসুল (দঃ) মৃত ব্যক্তিকে ভাল বলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং খারাপ বলতে নিষেধ করেছেন। তাই আমাদের দেশে জানাযা উপস্থিত হলে ইমাম সাহেব বলেন- লোকটি কেমন ছিল? উপস্থিত লোকজন বলেন- খুব ভাল ছিল। মূলতঃ ইহাই ইবনে ওমরের বর্ণিত হাদিসের শিক্ষা। এতে ভাল বলার আদেশ রয়েছে এবং মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ قُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْئَلْهُ عَنِ

الواحد رواه البخارى

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসুলে করিম (দঃ) এরশাদ করেন- চারজন মুসলমান কোন মুসলমানকে ভাল বলে স্বাক্ষ দিলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দেন। আমরা বললাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)। তিন জনে স্বাক্ষ দিলে তার হুকুম কি? তিনি বলেন- তিনজনে স্বাক্ষ দিলে আল্লাহ তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দেন। আমরা বললাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! দুইজন। তিনি বললেন-দুইজন। অর্থাৎ দুইজন সাক্ষ দিলে তাকেও আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দেন। অতঃপর আমরা একজন সম্পর্কে আর প্রশ্ন করি নাই। (বুখারী শরীফ)

এখন প্রশ্ন হলো- লোকটি জীবনে নামাজ পড়ে নাই; রোযা রাখে নাই; এরপরও মারা গেলে আমরা বলি- লোকটি খুব ভাল ছিল। ইহা বাহ্যতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য-এর মত মনে হয়। এর উত্তর কি? সঠিক জবাব হলো-

ইহা মিথ্যা সাক্ষ্য নয়। কারণ নামায না পড়া কবিরা গুনাহ। রোযা না রাখা কবিরা গুনাহ। কিন্তু সে তো মোমিন। তার মধ্যে ঈমান আছে। তাই আমরা তার জানাযায় উপস্থিত হয়েছি। কাফেরের জানাযা হয়না। **ঈমানই তার সবচেয়ে বড় সম্পদ।** ঈমানের কারণেই আমরা তার জানাযা পড়ি। মুসলমানের কবরস্থানে তাকে দাফন করি। **সুতরাং সে- কাফের, বেঈমান ও মুনাফিক থেকে ভাল।** সুতরাং ভাল বলা জায়েয।

উল্লেখিত হাদিছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে- মানুষ মারা গেলে তাদেরকে ভাল বলে সাহায্য করতে হবে। ইহা রাসুলের সুন্নত। যারা এই কাজ থেকে মানুষকে বাধা দেয়- তারা মূলতঃ মানুষকে রাসুলের (দঃ) সুন্নাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তারা শুধু মানুষের দুশমন নয় বরং তারা রাছুলেরও (দঃ) দুশমন। হে আল্লাহ! দুশমনে রাসুল (দঃ) থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) আন্তর্জাতিক কনফারেন্স।

স্থান ঃ জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তন, ঢাকা।

তারিখ ঃ ১৯শে মে রোজ শনিবার বেলা ১০ ঘটিকা।

আমন্ত্রিত মেহমানঃ

- মুফতি আল্লামা হোসাইন ছিদ্দিকী রেজভী আবুল হাক্কানী, ভারত।
- ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা কাজী নূরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব (চট্টগ্রাম)
  প্রেসিডিয়াম মন্ডলীর সভাপতি- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত।
- শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতী ওবায়দুল হক নঈমী সাহেব, প্রধান মোহাদ্দেস জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলী, চট্টগ্রাম।
- বুলবুল বাগে বেরেলী আল্লামা আবুল কাশেম নূরী, মোহাদ্দেছ, আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া মাদ্রাসা।

আরও দেশ বরেণ্য সুন্নী উলামায়ে কেরাম ও বুদ্ধিজীবিবৃন্দ।
দলে দলে যোগ দিয়ে দুশমনের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিন।

আয়োজনে ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত

বিঃদ্রঃ- সুন্নী ভাইদের নিকট আর্থিক ও নৈতিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য- অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলীল

মধু! মধু!! মধু!!!

মধু সর্ব রোগের ঔষধ- তাই নির্ভেজাল মধু ব্যবহার করুন এবং অন্যকে ব্যবহারে উৎসাহিত করুন। ১০০% গ্রান্টি যুক্ত বিশুদ্ধ মধু মসুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। বেজাল প্রমাণ করতে পারলে সম্পূর্ণ মূল্য ফেলত এবং প্রমাণকারীকে উপযুক্ত পুরস্কৃত করা হবে।

মূল্য প্রতি কেজি- ২৫০ টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ শাহজাহান পুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ টাকা ১২১৭ প্রতি শুক্রবার জুমার টাইম।

সৈয়দ আহমদ বেরলবী ঃ ইতিহাসের নিরিখে

আল্লামা শাহ হোসেইন গার্দেজী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

দাওয়াত খাওয়ার দৃশ্যঃ

সৈয়দ সাহেবের ভক্ত ও মুরীদানরা অকারনে অন্য পীর সাহেবদের সমালোচনা করে বলে থাকে যে, তারা নাকি মুরিদ ও মু'তাক্বিদগনের বাড়ীতে বেশী বেশী দাওয়াত খান এবং নজরানা আদায় করে থাকেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেবের দিবারাত্রির প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে - তিনি দাওয়াত খাওয়া ও নজরানা আদায় করার ক্ষেত্রে সকলকে টেক্কা মেরেছিলেন। প্রথমে তার দাওয়াত খাওয়ার কিঞ্চিত দৃশ্য দেখা যাক এবং পরে নজরানা আদায়ের খেলাও দেখে নিন।

জাঁকজমকপূর্ণ দাওয়াত সমূহ

(বুড্ডানা শহরে) বেশীর ভাগ খানা পাকানো হতো- মাওলানা আবদুল হাইয়ের ওখানে। উনি প্রত্যেক দিন চরম জাকজমকপূর্ণ খানা তৈরী করতেন।

সৈয়দ সাহেব যদি এতে বাধা দিতেন, তবে মাওলানা হাই সাহেব বলতো- "হুজুর! আপনার সামান্য আরামের জন্য যদি আমার ঘরও বিক্রি করতে হয়, তাহলে সেটাকে আমি সৌভাগ্য মনে করবো" (গোলাম রসুল মেহের কৃত সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ১২৭)

মন্তব্য ঃ মাওলানা আবুদল হাই বুড্ডানভী সাহেব একজন আলেম হয়েও জাঁকজমকপূর্ণ খানা তৈরী করে অপব্যয়ের অপরাধে লিপ্ত হয়েছিলেন। কুরআন হাকীমে তো অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এখানে যেহেতু পীর আর মুরিদের ব্যাপার, তাই আমরা খানার ব্যাপারে অধিক কিছু বলবো না।

পীরজাদাগণের ন্যায় সফর

সৈয়দ সাহেব যখন হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহরের উদ্দেশ্যে সফরে বের হতেন- তখন সাধারনতঃ পীরজাদাগণের ন্যায়ই পন্থা অবলম্বন করতেন। আমরা তো এমন উপযুক্ত নই যে, এ ব্যাপারে কিছু মন্তব্য করি। গোলাম রসুল মেহের সাহেবই এব্যাপারে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা এভাবে করেছেন-

"এই সফর সমূহ দৃশ্যতঃ পীর সাহেবান ও পীর জাদাগণের ন্যায়ই ছিলো - অর্থাৎ সৈয়দ সাহেব নিজের কাফেলা নিয়ে শহরে শহরে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়াতেন। প্রত্যেক স্থানে দাওয়াতও হতো" অন্যত্র লিখেছেন- "সৈয়দ সাহেবের সাধারণ নিয়ম যদিও ঐ ধরনেরই ছিলো- যে ধারায় অভ্যস্থ ছিলেন পীরজাদাগণ" (গোলাম রসুল মেহেরকৃত সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ১২৮)।

উপরোক্ত বক্তব্য শুনে যদি আপনি মন্তব্য করেন যে, সৈয়দ সাহেবের কাফেলা খানার দাওয়াতের তালাশেই ঘরে ঘরে ফিরছিলেন- তা হলেও বাড়িয়ে বলা হবেনা।

আযিমুশশান দাওয়াতঃ

"মুর্শিদাবাদের দেওয়ান গোলাম মুর্তাদা সৈয়দ সাহেবের কাফেলাকে থামিয়ে বারবার অনুরোধ করলেন এবং বললেন- "আমার জন্মস্থান (কুহনায়) চলুন"। যে বাংলোতে সৈয়দ সাহেবের থাকার ব্যবস্থা করলেন- তার সাজানী ও মেরামত বাবদই তখনকার দিনের ৫ হাজার টাকা খরচ করলেন। বাংলোর বাইরে বিরাট বাজার বসানো হলো এবং একথা ঘোষণা করে দেয়া হলো যে, সৈয়দ সাহেবের সঙ্গীসাথীরা যা কিছু খরিদ করবেন- তার খরিদমূল্যের একটি হিসাব যেন রাখা হয। আমি (মূর্তাদা) নিজে ঐ মূল্য পরিশাধ করে দেবো" (গোলাম রসুল মেহের কৃত সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ২২৯)।

উক্ত আয়োজনকে যদি অপব্যয় না বলা হয়, তাহলে এমন কোন্ ব্যয় আছে- যাকে অপব্যয়ের নিকৃষ্ট নামে অভিহিত করা যাবে? মনে হয়- সৈয়দ সাহেবের দরবেশী আর শাহ ইসমাইল দেহলভীর কাফের বানানোর কলম ঐ সময় শুকিয়ে গিয়েছিল। তা না হলে তারা নিশ্চয়ই এই অপব্যয় ও বিদআর্তি কর্মকাণ্ডকে তিন অক্ষর বিশিষ্ট কাফ- ফা-রা- (কাফের) নামে অভিহিত করতেন। যারা মিলাদুন্নবীর জলসা- জুলুসের খরচকে অপব্যয় বলে নবী প্রেমিক মুসলমানকে শয়তানের ভাই বলে আখ্যায়িত করছে- তারা সৈয়দ সাহেবেরই খাস ভক্ত- গোলাম মোর্তাদার উপর ঐ তিনটি অক্ষর কেন ব্যবহার করছেন না?

পোলাওর মধ্যে ঘিয়ের আধিক্যঃ

"(বোম্বাইশহরে) প্রত্যহ জাঁকজমকপূর্ণ দাওয়াত সমূহ হতো। পোলাওর মধ্যে ঘিয়ের পরিমান ছিল বেশী"।

(গোলাম রসুল মেহেরকৃত সৈয়দ আহমদ পৃঃ ২২৯)।

অন্যের উপর দোষারোপকারী সৈয়দ সাহেবের গুণগ্রাহীরা সৈয়দ সাহেবের দাওয়াতের এই কাহিনী পাঠ করেও যদি চিন্তা না করে- তা হলে আফসোস করা ছাড়া আর কিইবা করা যায়?

দাওয়াতের প্রাচুর্যঃ

"খাওয়ার দাওয়াত বিভিন্ন লোকদের তরফ থেকে একের পর এক আসতে লাগলো। সৈয়দ সাহেব মুসল্লিদেরকে ত্রিশ ত্রিশ বা চল্লিশ চল্লিশ জনের দলে বন্টন করে দিতেন এবং দাওয়াতকারীদের পালা নির্ধারিত করে দিতেন- যেন কোন দাওয়াতকারীর কোন প্রকারের অভিযোগ না থাকে। তিনি চারসাদ্দা শহরে আনুমানিক দু'সপ্তাহ অবস্থান করেন। উভয় বেলা মুসল্লিদের বিভিন্ন গ্রুপ দাওয়াতকারীদের ওখানে গিয়ে খানা খেয়ে আসতো" (গোলাম রসুলের সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ৩২৭)

মনে হয়- সৈয়দ সাহেব সদলবলে মুজাহেদীনকে নিয়ে দাওয়াত খাওয়ার বড় নিমন্ত্রণ প্রিয় ছিলেন।

দরগাহ্‌তে খানার দাওয়াতঃ

"মাগরিবের সময় তিনি চমক্‌নি পৌছলেন- যেখানে শেখ ওমর নামক এক বুযুর্গের মাযার ছিল। তার আওলাদের মধ্যে এক মহিলা উক্ত মাযারের মোতাওয়াল্লিয়াহ ছিলেন। উক্ত মহিলা পুরা লস্করের জন্য খানা পাকাইলেন। ঐ খানার মধ্যে খিচুড়ী, গোস্ত এবং তন্দুরী রুটিও ছিল" (গোলাম রসুল মেহের কৃত সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ৬৬২)।

খানার দাওয়াত- তা-ও আবার এক মাযারের মোতাওয়াল্লি মহিলার পক্ষ হতে এবং দরগাহের মধ্যেই। এই ধরনের খানার দাওয়াতে তাদের কারও আপত্তি ছিল না।

(অথচ মাযারের পয়সায় জেয়াফত খাওয়া তাদের মতেই হারাম ও বিদ্‌আত- অনুবাদক)।

দাওয়াত এবং নজরানাঃ

"সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম খুব জাঁকজমক করে তাকে দাওয়াত দিলেন। অন্যান্য হাদিয়া ছাড়াও একটি মহিষ সৈয়দ সাহেবকে নজরানা হিসাবে দিলেন। ঐ মহিষটি অসম্ভব রকমের ঢিলা-ঢালা এবং এমন মোটাতাজা ছিল- মনে হয় যেন একটা হাতীর বাচ্চা" (গোলাম রসুলকৃত সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ৩৯৫)।

ধোঙ্গল সিং- কর্তৃক দাওয়াত ঃ

জনাব গোলাম রসুল মেহের লিখেছেন-

"সাহারানপুর তহসীলদার ধোঙ্গল সিংও সৈয়দ সাহেবকে দাওয়াত করলেন"। (সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ১২৮)।

যদি মনে কোন কষ্ট না নেন- তাহলে এতটুকুই আরজ করবো যে, সৈয়দ সাহেবের দাওয়াতের বাখান বয়ান করাই মেহের সাহেবের আসল উদ্দেশ্য- চাই দাওয়াত কারী কাফের হোক অথবা মুসলমান ।

ইংরেজ সৈন্যদের দাওয়াতঃ

"ইংরেজ সিপাহীরা খানার দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য অনুনয় করলে সৈয়দ সাহেব বললেন- এই শর্তে দাওয়াত মঞ্জুর করা হলো যে, আমি যা বলবো- তা পাকাতে হবে। সিপাহীরা তা মেনে নিল" (গোলাম রসুল মেহেরের সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ১২৮)। মন্তব্য নিস্প্রয়োজন।

ইংরেজের রক্ষিতা বিবির আমন্ত্রণঃ

"কানপুরের এক ইংরেজ সাহেবের মুসলমান স্ত্রী নিজ জামাতা মির্জা আবদুল কুদ্দুসকে রায়বেরেলী পাঠিয়ে সৈয়দ সাহেবকে ডেকে আনলেন" (উক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৫৯)।

"সৈয়দ সাহেব গঙ্গা অতিক্রম করে ইংরেজ সাহেবের মুসলমান স্ত্রীর ঘরে তশরীফ নিয়ে আনলেন" (উক্তগ্রন্থ ৬০)।

ইংরেজরা ঐ সময় অনেক মুসলমান মহিলাকে স্ত্রীর মত ব্যবহার করতো। এই কানপুরী মহিলাও ইংরেজ সাহেবের এমনই একজন রক্ষিতা ছিল- যার ঘরে সৈয়দ সাহেবের শুভাগমন হয়েছিল।

ইংরেজ কর্তৃক নিমন্ত্রণ ঃ

সৈয়দ সাহেবের ভাগিনা সৈয়দ মুহাম্মদ আলী লিখেছেন-

"যখন এশার নামাজ হয়ে গেলো - তখন দিদ্ বানু আরজ করলো যে, কিছু মশাল আমাদের দিকেই আসছে। এমন সময় দেখা গেল- একজন ইংরেজ সাহেব ঘোড়ায় চড়ে বিভিন্ন ধরনের খানা নিয়ে আমাদের নৌকার কাছে এসে দাঁড়ালো এবং জিজ্ঞাসা করলো- পাদ্‌রী সাহেব কোথায় আছেন? সৈয়দ সাহেব নৌকা থেকে নিজেই জবাব দিলেন যে, আমি এখানেই আছি- আপনি তশরীফ নিয়ে আসুন। ইংরেজ সাহেব তৎক্ষনাৎ ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং নিজের কাদপ মাথা থেকে নামিয়ে নৌকায় সৈয়দ সাহেবের কাছে এসে হাজির হলেন। মেজাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর- সে নিবেদন করলো- আমি আমার চাকর বাকরদেরকে আপনার কাফেলার আগমনের খোঁজখবর নেয়ার জন্য মোতায়েন করে রেখেছিলাম। আজ খবর পেলাম যে, আপনি আপনার কাফেলা সহ এদিকে

আসছেন। এই সুসংবাদ শুনে আমি উপস্থিত যা কিছু ছিল- তৈরী করেছি এবং আপনার খেদমতে হাজির করেছি।" (সৈয়দ মুহাম্মদ আলী কৃত মাখজানে আহমদী- পৃঃ ২৭)।

জিনাখোর ইংরেজের নিমন্ত্রণ গ্রহণঃ

"এক ইংরেজ সাহেবের মুসলমান স্ত্রী দাওয়াত করার উদ্দেশ্যে সৈয়দ সাহেবের কাফেলা থামালো। সৈয়দ সাহেব উক্ত মহিলার দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এরপর ইংরেজ সাহেব নিজে আসলো এবং আরজ করলো- ওর দাওয়াত না নিয়ে থাকেন- কিন্তু আমার দাওয়াত গ্রহণ করতে তো আপত্তি থাকার কথা নয়। এ কথার পর তিনি ইংরেজ সাহেবের দাওয়াত কবুল করলেন" (গোলাম রসুল মেহের কৃত সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ১৫০)।

[মুসলমান স্ত্রী রাখা হারাম সুতরাং জিনাখোর- অনুবাদক]

এক ইংরেজ মহিলার নিমন্ত্রণ গ্রহণঃ

"বাইআত গ্রহণকারীদের মধ্যে মিন্‌ডুদ নামের এক ইংরেজ সাহেবের স্ত্রীও ছিল। ঐ মহিলা বাইআত হওয়ার পর সাত দিন পর্যন্ত দু'বেলা সৈয়দ সাহেবকে দাওয়াত করেছিল এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহ এক আলীশান ঘর তাঁকে থাকার জন্য হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছিল" (মাওলানা জাফর থানেশ্বরীকৃত সাওয়ানিহে আহমদী পৃঃ ১২৬)।

[সৈয়দ সাহেব ইংরেজ বিরোধী হলে দাওয়াত পাবে কেন?]

ইংরেজ কোম্পানীর উকিলের দাওয়াত ঃ

সৈয়দ সাহেব কলকাতায় আসলে মুন্সী আমিনুদ্দীন আহমদের ঘরে অবস্থান করতেন। উক্ত মুন্সী সাহেব কে ছিলেন - সে সম্পর্কে গোলাম রসুল মেহের লিখেছেন-

"এই মুন্সী আমিনুদ্দীন আহমদ- যিনি ছিলেন বাংলার উচু খান্দানের লোক- কলকাতায় যাকে উচ্চমানের ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হতো। ইংরেজ কোম্পানীতে তিনি উকিলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোম্পানীর পুরা এলাকার যত মোকদ্দমা কলকাতার কেন্দ্রীয় সরকার বরাবরে আসতো- সবগুলোই মুন্সী সাহেবের মাধ্যমে ফাইল করা হতো" (গোলাম রসুল মেহের কৃত সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ১০৫)।

ইংরেজ সাহেবগণের, তাদের স্ত্রীগণের এবং কর্মচারীও কর্মকর্তাগণের এই বিপুল সংখ্যক দাওয়াত সৈয়দ সাহেবের ইংরেজ প্রীতিরই ইঙ্গিত বহন করে। তা না হলে তাদের কথিত পাদ্‌রী সাহেবকে (সৈয়দ সাহেব) দাওয়াত করার অন্য কোন প্রয়োজন ছিল না। ইংরেজরা যখন সৈয়দ সাহেবের ব্যাপারে ভীতও ছিলনা এবং সৈয়দ সাহেব নিজেই যখন পরিস্কার ভাষায় ঘোষনা দিয়েছিলেন যে, ইংরেজ সরকারের সাথে আমার কোনরূপ শত্রুতা নেই, অপর দিকে সৈয়দ সাহেবের খানার দাওয়াত গ্রহণ- ইত্যাদি ঘটনার দ্বারা ইংরেজদের সাথে তার ঘনিষ্টতাই প্রকাশ করছে।

মহারাজার রাজকীয় দাওয়াতঃ

"গোয়ালিয়ারের মহারাজার পক্ষ হতে মেহমানদারীর পূর্ণ ইনতিজাম করা হয়েছিল। কয়েকবার হিন্দু রায়েরা দাওয়াত করেছিল। একটি দাওয়াতের বিবরন বর্ণনাকারীগন এভাবে দিয়েছেন- "মিরাটী পদ্ধতির খানা তৈরী করা হয়েছিল, শিরনাম, পরেঠা, পোলাও, মিত্‌নাজিন, ক্কালবা, ফিরনী, ইয়কুতি কাবাব, পছেন্দে, মোরগ বিরানী- ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। সৈয়দ সাহেব এবং বোলন্দ মর্তবার সাথী সঙ্গীদের হাত হিন্দু রায় সাহেবরা ধৌত করে দিয়েছিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর যেসব পান পেশ করা হয়- তা ছিল জরী পাতায় মোড়ানো। অনেক উপঢৌকন পাত্রে রেখে নজরানা দেয়ার জন্য আনা হয়েছিল। ঐ গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মূল্যবান একটি মুতিহার এবং দুটি চোগা। ঐ চোগার উপর জরীরের উত্তম কারুকার্য করা হয়েছিল" (গোলাম রসুল মেহের কৃত সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ২৭৪)

হিন্দু রাজা ও রায় সাহেবরা কোন্ ইসলাম ও কোন্ জিহাদের আনন্দে সৈয়দ সাহেবের উদ্দেশ্যে এমন আজিমুশশান দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছিল? ইহার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই কিছু একটা ছিল। আর ঐ উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, মহারাজাদের জন্য ইংরেজ সরকারের সন্তুষ্টির প্রয়োজন ছিল। ঐ সন্তুষ্টি অর্জন এপথেই হয়তো সম্ভব হয়েছিল। (এটা রাজনৈতিক চানক্য কৌশল এবং এক প্রকারের ঘুষ ও বটে- অনুবাদক)

সৈয়দ সাহেবও খুব মজা করেই এসব দাওয়াত খেতেন। সৈয়দ সাহেবের সংশ্লিষ্ট মুরিদানগণ আপাততঃ প্রথমে আপন পীরে তরিকতের দাওয়াতের দৃশ্যটা দেখে নিন। পরে অন্যের সমালোচনা করুন।

নজরানার ঝলকানীর নমুনাঃ

সৈয়দ সাহেব জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে খুবই টানা পোড়নে ছিলেন। জীবিকার অনুসন্ধানে প্রথমে তিনি রায়বেরেলী থেকে ১৯ বৎসর বয়সেই লক্ষ্মৌ সফর করেন। কিন্তু সফল হতে পারেন নি। এক খান্দানী লোক তাকে দুবেলা খাবার দিতেন। সৈয়দ সাহেব নিজে গিয়ে উক্ত খানা নিয়ে আসতেন।

যখন কিছু সংখ্যক ওহাবী পছন্দ লোক তাদের মতলব হাসিল করার জন্য সৈয়দ সাহেবের বেলায়েতের প্রচার

প্রপাগান্ডা শুরু করলো, তখন নজরানার আগমন শুরু হয়ে গেল। তাতে সৈয়দ সাহেব নিজে এবং সংশ্লিষ্টরা সফলতা লাভ করতে লাগলেন। নজরানা, চাঁদা ও সদকা ছাড়া অন্য কোন স্থায়ী ও যুক্তিসঙ্গত আমদানী তাদের ছিল না। জীবিকা অর্জনে দারিদ্রতার কারণে তারা সব সময় এই প্রতীক্ষায় থাকতেন যে, কোন্‌খান থেকে দাওয়াত ও নজরানা আসবে। যখন হতাশা আসতো- তখন লেনদেন করে চলতেন।

এ প্রসঙ্গে গোলাম রসুল মেহের লিখেছেন-

"তিনি তার এক বন্ধু শাহমীর-এর নিকট থেকে দুশো টাকা ধার করলেন। যখন নজরানার টাকা আসলো, তখন পরিশোধ করে দিলেন।" (গোলাম রসুল মেহের কৃত সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ১২৩)।

কিন্তু যখন তিনি আপন পিতৃ ভূমিতে গেলেন- তখন নজরানায় ঘাটতি দেখা দিল। সময় অতি কষ্টে কাটতে লাগলো। এ প্রসঙ্গে মাওলানা জাফর থানেশ্বরী লিখেছেন-

"পিতৃভূমিতে যাওয়ার পর দৈনিক নজর নেয়াজের আমদানী বন্ধ হয়ে গেল" (মাওলানা জাফর থানেশ্বরীকৃত সাওয়ানিহে আহমদী পৃঃ ৯৩)

মন্তব্য ঃ এর কারণ ছিল- হয়তো এলাকাবাসীরা তার বেলায়াত স্বীকার করতো না অথবা এ সম্পর্কে তাদের অজানা ছিল এবং পূর্বের মতই তাকে বোকা মনে করতো।

এছাড়াও সৈয়দ সাহেব বিভিন্ন সময়ে মানুষের নিকট থেকে এ আশায় কর্জ নিতেন যে, হয়তোবা নজরানা অথবা চাঁদা পাওয়া যাবে। সে সময় কর্জ শোধ করা যাবে। জনাব গোলাম রসুল মেহের বর্ণনা করেনঃ-

"বিভিন্ন যানবাহন ও বহনকারীদের পারিশ্রমিক বাইশ টাকা বাকী ছিল। এ সময় মানুষ থেকে কিছু নজরানা এসেছিল। তা থেকে উক্ত বাইশ টাকা পরিশোধ করে অতিরিক্ত তিন টাকা বখশিশ দিলেন"। (গোলাম রসুল মেহেরকৃত সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ১৮৫)।

কার্পেট নজরানার গল্প ঃ

সৈয়দ সাহেব শুধু টাকা পয়সার নজরানাই নিতেন না বরং যাই পেতেন- নিয়ে নিতেন। গোলাম রসুল মেহের লিখেছেন-

"শেখ (গোলাম আলী) সাহেব (এলাহাবাদ) বিশ প্রকারের হাদিয়া ছাড়াও একটি মূল্যবান কার্পেট সৈয়দ সাহেবের খেদমতে পেশ করেন" (উক্ত গ্রন্থ ১৫৭ পৃঃ)।

একটু পরেই পূণঃ লিখেছেনঃ

"নজর হিসাবে একটি মূল্যবান পারছে সৈয়দ সাহেবের খেদমতে এসে গেল"। (উক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৫৮)

মন্তব্য ঃ সম্ভবতঃ ঐ যুগে সৈয়দ সাহেব ছাড়া অন্য কেউ সাহায্য পাওয়ার বেশী উপযুক্ত ছিল না- তাই।

মহিষ নজরানা

"কারুতে(সিন্ধু) সৈয়দ চৌরান শাহ নামে এক উল্লেখযোগ্য বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। সৈয়দ সাহেবের নির্দেশক্রমে সৈয়দ হামিদুদ্দীন ও সৈয়দ আওলাদ হাসান নামের দু'ব্যক্তি উক্ত বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। উক্ত বুযুর্গ ব্যক্তি সৈয়দ সাহেবের সাথে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তিনি নজরানা হিসাবে সৈয়দ সাহেবকে একটি বড় মহিষ দিলেন।" (গোলাম রসুলকৃত সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ২৮৪)।

মন্তব্য ঃ যিনি পারছে কবুল করতে অস্বীকার করেন না- তিনি এতবড় মহিষকে ছেড়ে দেবেন কি করে? যদি বিশুদ্ধ আকিদাপন্থী কোন মুসলমান সৈয়দ সাহেবের ও তার সঙ্গী সাথীদের বাতিল আক্বিদা সম্পর্কে না জেনে কোন নজরানা পেশ করতো - তাহলে তা বিনা দ্বিধায় তারা কবুল করে নিতেন। (যেমন এক্ষেত্রে হয়েছে) কিন্তু এই শুদ্ধ আক্বিদাপন্থী কোন মুসলমান যদি এই মহিষটি হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী, খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী অথবা হযরত বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দের মাযার শরীফের কোন বাসিন্দাকে দান করে দিতেন, তাহলে গাইরুল্লাহর নামে দেওয়ার অপরাধে তা বোধ হয় হারাম ঘোষনা করা হতো। এখন সৈয়দ সাহেবের খেদমতে পেশ করার কারনে উক্ত মহিষটি আর হারাম হলো না। মনে হয় যেন- সৈয়দ সাহেব গাইরুল্লাহ নন- গাইরুল্লাহ কেবল শেখ জিলানী প্রমুখ অলি- আল্লাহগন।

আওলাদ নজরানা

নজরানা সীমা অতিক্রম করে চূড়ান্তে পৌছে গিয়েছিল। মহিষের চেয়েও বড় নজরানা এখন পেশ করা হচ্ছে। পড়ুন এবং মাথা মারতে থাকুন। জাফর থানেশ্বরীর ভাষায় ঃ

"সবচেয়ে আশ্চর্য তোহ্‌ফা- যা শেখ ফরজন্দ আলী সাহেব নিয়ে এসেছিল- তা হলো- আমজাদ নামের এক নওজোয়ান ছেলে। ফরজন্দ আলী সাহেব আপন পুত্রকে হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহর ন্যায় আল্লাহর রাস্তায় মান্নত করে সৈয়দ সাহেবের হাতে হাওয়ালা করে দিলেন" (জাফর থানেশ্বরী কৃত সাওয়ানিহে আহমদী পৃঃ ১৬৮)।

- চলবে

সৈয়দ আহমদ বেরলভী সম্পর্কে যুগ জিজ্ঞাসা

কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

গত সংখ্যায় সৈয়দ আহ্মদ বেরলভী সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছিলাম। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বালাকোটের প্রান্তরে সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মৃত্যু একটি তাৎপর্যহীন ঘটনা। পরবর্তী আজাদী আন্দোলনে এর কোনো ইম্প্যাকট্ তথা প্রভাব নেই। কেননা, নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাহ বা টিপু সুলতানের মতো রাজন্যবর্গ উপমহাদেশীয় শক্তিগুলোকে বৃটিশের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা সফল হন নি সত্য, কিন্তু তাদের এ চেষ্টার জন্যে ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। ইতিহাসে তাদেরকে যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, সৈয়দ আহমদ বেরলভী উপমহাদেশীয় শক্তিগুলোর মধ্যে অনৈক্য ও বিভাজন সৃষ্টি করে প্রকারান্তরে বৃটিশের শাসনকে পাকাপোক্ত করেছিলেন। এ ব্যাপারে গত সংখ্যায় আলোকপাত করেছিলাম। এবারে আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

সৌদি সরকার কর্তৃক প্রকাশিত "শেখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব" শীর্ষক আরবী গ্রন্থের (১৯৬৮ সংস্করণ) ৭৮ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে যে- **সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাইল দেহলভীকে আরবীয় ওহাবীরা ১৮২০ সালে ভারত উপমহাদেশে ওহাবী মতবাদ প্রচারের জন্যে প্রতিনিধি নিয়োগ করে- যখন তিনি হজ্ব করে ফিরে আসল।** এ সময় সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাইল দেহলভী হজ্ব উপলক্ষে আরবে গিয়েছিলেন। "শায়খ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব" শীর্ষক এ গ্রন্থটি বাদশাহ ফয়সালের নির্দেশে ছাপা হয়। তাই এটা নির্ভরযোগ্য। যদি কোনো এজেন্সীদাতা বলেন যে, কাউকে তিনি এজেন্সী দিয়েছেন, তবে তাঁর এ সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য ও অকাট্য হবে। আলোচ্য গ্রন্থটির সাক্ষ্য হচ্ছে- সৈয়দ আহমদ বেরলভী আমাদের খলিফা। আর এদেশীয় তার অনুসারীরা বলেন- ওহাবী আন্দোলনের সাথে সৈয়দ আহমদ বেরলভীর কোন সম্পকই ছিল না। এখন কার কথা বিশ্বাস যোগ্য? পাঠকরাই তা নির্ধারণ করবেন। উক্ত গ্রন্থ সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাইল দেহলভীর প্রকৃত মিশন সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট ধারণা দেয়- তারা ওহাবী মতবাদ প্রচার করতে নেমেছিলেন মাত্র। ধর্মীয় অঙ্গনে বিভ্রান্তি ছড়ানোই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য।

মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর প্রণীত তাকভিয়াতুল ঈমান শীর্ষক গ্রন্থ আমি পড়েছি। এতে তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফায়াত অস্বীকার করেছেন, নবী-ওলীগণকে মুচি চামারের সমকক্ষ বানিয়েছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বড় ভাই ও গ্রাম্য জমিদারের মতো বলেছেন এবং আরো অনেক বেয়াদবী ও কুফরী মূলক ৭০টি কথা বলেছেন- যা ঈমান ধ্বংসকারী। ইসমাইল দেহলভীর এ গ্রন্থের উর্দু ও বাংলা কপি আমার হাতে মওজুদ আছে। তাই এ ব্যাপারে প্রয়োজন হলে খন্ডনমুলক লেখা সরবরাহ করতে আমি প্রস্তুত আছি। ইসমাইল দেহলভী সম্পর্কে আরো অভিযোগ আছে। পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মাসউদ আহমদ সাহেব ইতিহাসবিদ মীর্জা হায়রাত দেহলভীর বরাত দিয়ে নিজগ্রন্থ 'গুনাহে বে-গুনাহী' পুস্তকে লিখেছেন যে, ইসমাইল দেহলভী বলেছেন, "বৃটিশ শাসনের অধীনে আমরা সকল প্রকার স্বাধীনতা ভোগ করছি- যদি কোনো বহিঃশত্রু তাঁদেরকে আক্রমন করে, তবে সেই শত্রুর সাথে লড়াই করা এবং নিজ সরকারের প্রতিরক্ষা করা মুসলমানদের উপর অবশ্য কর্তব্য (ওয়াজিব) হয়ে দাঁড়াবে" (মীর্জা হায়রাত দেহলভী প্রণীত হায়াতে তাইয়েবা, দিল্লী, পৃষ্ঠা-২৯৬)।

ইংরেজের পক্ষে লড়াই করা ওয়াজিব জেনেই বোধ করি পাঞ্জাবের পাঠান ও শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাইল দেহলভী। অতএব, এক্ষণে হিসেব মিলে গেছে- বৃটিশের দালালি করাই ছিল তাদের মূল মিশন। বৃটিশকে রক্ষা করার জন্যই তারা সীমান্তে গিয়েছিলো। শিখদের বিরুদ্ধে ইংরেজরাই তাকে লাগিয়ে দিয়েছিল। জাফর থানেশ্বরীও তাই লিখেছেন।

সৈয়দ আহ্মদ বেরলভীকে তাঁর ভক্তরা পরবর্তী আজাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ বানাতে চান। তাঁরা তাঁকে উপমহাদেশের ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে উপস্থাপন করতে তৎপর। এমতাবস্থায় ইতিহাসকে সঠিক ভাবে প্রতিফলন করতে আমরা অপ্রিয় সত্য কথাগুলো তুলে ধরেছি মাত্র। আশা করি গবেষকবৃন্দ এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত তথ্য দিয়ে বিষয়টিকে সবার সামনে পরিস্ফুট করবেন। মাসিক বাইয়্যিনাত বা সমমনা পত্রিকাগুলো সঠিক ইতিহাস প্রচার করলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে আমি মনে করি। সঠিক ইতিহাস অবশ্যই আছে-শুধু প্রচারের প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মহাসমাবেশে -অধ্যক্ষ এম. এ. জলিল

স্বাধীনতা বিরোধী ইসলাম বিকৃতকারীদের উগ্রতা ইসলামকে কলঙ্কিত করেছে

বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল বলেছেন- ইসলাম বিশ্বজনীন শান্তির ধর্ম। অথচ বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধী ও ইসলাম বিকৃতকারীদের উগ্রতা ইসলামকে কলঙ্কিত করেছে। প্রকৃত ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্কে নেই। সুন্নী অনুসারীদেরকেই সুন্নীয়তের আদর্শে ইসলামী আইন বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে- অন্যরা নয়।

তিনি ৭-৪-২০০১ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বিকাল ৩.০০ টায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মহাসমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। এতে অন্যান্যর মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রেসিডিয়াম সদস্যবৃন্দ যথাক্রমে- শেরে মিল্লাত মুফতী ওবায়দুল হক নঈমী, আল্লামা অধ্যক্ষ জালাল উদ্দিন আলকাদেরী, অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন চৌধুরী, গাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ, আল্লামা বাহাদুর শাহ্ মোজাদ্দেদী, মহাসচিব এম. এ. মতিন। যুগ্ম মহাসচিব স.উ.ম. আব্দুস্ সামাদ ও এডভোকেট আবুনাছের তালুকদার এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন- সাংগঠনিক সচিব আল্লামা জয়নুল আবেদীন জুবাইর, এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, অধ্যক্ষ মাওলানা ইয়াকুব আলী খান, মাওলানা কাজী সোলায়মান চৌধুরী, এম. এন. ইসলাম জেহাদী, এম, সোলাইমান ফরিদ, অধ্যক্ষ এস.এম. ফরিদ, কাজী আনোয়ারুল ইসলাম খান, মাওলানা জাহান শাহ আবেদী প্রমুখ।

উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য আল্লামা নুরুল ইসলাম হাশেমী, আলহাজ এম. এ. ওহাব আলকাদেরী, আল্লামা অধ্যক্ষ আলী হোসাইন, আল্লামা কাজী মঈন উদ্দিন আশরাফী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (হারুন) এবং পীরে তরীকত আল্লামা অধ্যক্ষ শেখ আবদুল করিম সিরাজনগরী, পীরে তরীকত আব্দুল হামীদ আলকাদেরী, আল্লামা সৈয়দ অছিয়র রহমান, আল্লামা আবুল কাশেম নূরী, অধ্যক্ষ নুরুল আলম খান সহ দেশ বিদেশের প্রখ্যাত ওলামায়েকেরাম ও বুদ্ধিজীবিগণ।

অধ্যক্ষ আল্লামা এম. এ. জলিল আরো বলেন, ধর্মদ্রোহী, ইসলাম বিদ্বেষী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শত্রুরা যতনা ইসলামের ক্ষতি করেছে, তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে ইসলামের লেবেলধারী স্বাধীনতা বিরোধী ও বাতিল পন্থীরা। এদের হাত থেকে এদেশের মুসলমানদের ঈমান আক্বিদাকে হেফাজত করতে হবে। তিনি আরো বলেন- স্বাধীনতা পরবর্তী কোন সরকারই ইসলামের পক্ষে কথা বলেনি- বরঞ্চ ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতা কেন্দ্রীক ধ্বংসাত্বক রাজনীতির কারণে এদেশের ভাগ্য বিড়ম্বিত জনগণের ভাগ্যের কোনই পরিবর্তন হয়নি। গরীবদের জন্য কেউই কাজ করেনি- বরং কোটিপতির সংখ্যাই বেড়েছে বহুগুণে। ৩০ বছরে এ দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন ও অগ্রগতি হয়নি। বরং চুরি, ডাকাতি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সন্ত্রাস, ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে দেশকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। জননিরাপত্তা আইন দিয়েও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। নেতৃবৃন্দ বলেন- ইসলাম সবসময় মানবতার পক্ষে কথা বলেছে, ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা বাস্তব সম্মত পদ্ধতি দিয়ে মানুষের জীবনের সার্বিক মুক্তি নিশ্চিত করেছে। বক্তারা আরো বলেন, খোদা প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা বাদ দিয়ে মানুষের তৈরী মতবাদ চর্চা করতে গিয়ে মানুষে মানুষে বৈরীতা বেড়েছে। গরীব আরো গরীব হয়েছে। ২২ পরিবারের পরিবর্তে ২২ হাজার পরিবারের জন্ম হয়েছে। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সুন্নী আদর্শ ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকল্প নেই। ইসলামী ব্যবস্থায় ধনী ও গরীবের মধ্যে আকাশচুম্বি ব্যবধান থাকতে পারেনা।

বক্তারা বলেন- প্রকৃত ইসলামকে সমাজে বাস্তবায়ন করতে হলে এ দেশের সকল সুন্নী পীর মাখায়েখ, আলেম-ওলামা, বুদ্ধিজীবি সহ সকল শ্রেণীর ও পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সব বাতুলতাকে মোকাবেলা করে এ দেশে সুন্নীয়ত ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

মহাসচিব এম. এ. মতিন বলেন- মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করেই আমরা এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আল্লাহর অলীর সান্নিধ্যে এসে জঘন্য অপরাধীরাও শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হচ্ছে। আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বরা দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করলে জন নিরাপত্তা আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রয়োজন হবে না। আমরা সেই লক্ষ্যেই এদেশে কাজ করছি। তিনি দেশবাসীকে ইসলামী ফ্রন্টে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে বলেন- দেশ এখন দুইটি রাজনৈতিক শিবীরে বিভক্ত। অতীতে যারা দেশের কোন কল্যাণ করতে পারেনি তাদের হাতে দেশের ভবিষ্যত উন্নতি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিরাপদ নয়। তৃতীয় ধারা হিসাবে আমরা ইসলামের সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে এই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সুতরাং বিভিন্ন পন্থীদের ছায়ায় আশ্রয় না নিয়ে ইসলামের মূলধারা- আহলে সুন্নাতের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ফ্রন্টের পতাকা তলে সমবেত হওয়ার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান।

বক্তারা আরো বলেন- ইসলামী ফ্রন্ট আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে চলমান রাজনৈতিক সংঘাতে উদ্বিগ্ন। এ অবস্থায় আলাপ আলোচণার মাধ্যমে সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসন করে জনগণকে আশংকা মুক্ত করার জন্য তারা আহবান জানান।

বার্তা প্রেরক

অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলিল সাহেব হুজুরের নিম্নলিখিত সুন্নী আক্বিদাসম্পন্ন বইগুলো পড়ুন এবং ঈমান মজবুত করুন

- নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুজুরের জীবনী
- কারামাতে গাউসুল আজম [হযরত বড় পীর (রাঃ)-এর জীবনী]
- আক্বায়েদ ও মাসায়েল
- ইসলাহে বেহেস্তী জেওর (খণ্ডন)
- আহকামুল মাযার (মাযার সংক্রান্ত যাবতীয় মাসআলা)
- মিলাদ ও কিয়ামের বিধান (দলীল)
- আ'লা হযরত স্মরণিকা ১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯ ইং
- শিয়া পরিচিতি
- সুন্নীবার্তা আহ্‌লে সুন্নাতের মুখপত্র [ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আ'লা হযরত বিশেষ সংখ্যা]
- বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত

প্রাপ্তিস্থান ও এজেন্সী

- সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র, ১/১২ তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
- উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুলআযম জামে মসজিদ, ঢাকা ১২১৭।
- গাউছিয়া লাইব্রেরী, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
- কাজী অফিস, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।
- মুহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
- রেজভী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
- তৈয়্যবিয়া লাইব্রেরী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া মাদ্রাসা রোড, চট্টগ্রাম।
- আল-ইয়াকুত বুকস্ এন্ড ষ্টেশনারীজ, সাখাওয়াত ম্যানশন, মোগলটুলি, কুমিল্লা।
- ফরাজীকান্দি ওয়াইসিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, মতলব, চাঁদপুর।
- শাহজালাল লাইব্রেরী, মৌলভীবাজার।
- কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশন, ঢাকা।
- ছায়াবিথী জামে মসজিদ, মধ্যবাসাবো, ঢাকা।
- গাউছিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া লাইব্রেরী, মাদারটেক চৌরাস্তা, ঢাকা।
- মাদ্রাসায়ে সুন্নীয়া পেশোয়ারিয়া, বাসাইল রেলগেইট, নরসিংদী।
- নূরে মদিনা দরবার শরীফ, মিল গেইট, টঙ্গী, গাজীপুর।
- গাউছিয়া জামে মসজিদ, (নদীরপাড়), ভৈরব বাজার।
- আমিয়াপুর মহিলা মাদ্রাসা, পাঠানবাজার, মতলব, চাঁদপুর।
- পরশুরাম ফাজিল মাদ্রাসা, ফেনী।
- পানামা ডক ইয়ার্ড সংলগ্ন মাজার শরীফ, নতুন বাজার, চাঁদপুর।
- নওদাপাড়া বাজার, রাজশাহী।
- জালকুঁড়ি উচ্চ বিদ্যালয় জামে মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ।
- হাজী আলীম উল্লাহ সিনিয়র মাদ্রাসা, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
- লবাইরকান্দি আল-আমিন মাদ্রাসা, মতলব, চাঁদপুর।
- মাদ্রাসা আল-আকবার আল-উলুম, ফরদাবাদ, বি-বাড়ীয়া।
- দুলালপুর চন্দ্রমনি উচ্চবিদ্যালয়, হোমনা, কুমিল্লা।
- কুতুবিয়া দরবার শরীফ (চৌধুরী বাড়ী), বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।
- হেলাল মাইক সার্ভিস, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
- দারিয়ারপুর বাজার পাটোয়ারীপট্টি সুতার দোকান, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
- বাহার সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্র, রামপুরা বাজার, ঢাকা।